পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

GREEN CLIMATE FUND

ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন গ্রুপ (সিসিএজি)-এর আলোচ্য বিষয় সহায়িকা

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন গ্রুপ (সিসিএজি)-এর আলোচ্য বিষয় সহায়িকা

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন গ্রুপ (সিসিএজি)-এর আলোচ্য বিষয় সহায়িকা

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)

সম্পাদনায় :
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ইসিসিসিপি-ফ্লাড, পিকেএসএফ

সহযোগিতায় :
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ

প্রকাশনায় :
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ইসিসিসিপি-ফ্লাড, পিকেএসএফ

মুদ্রণে :
কলেজগেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
E-mail: collegegatepress2018@gmail.com
মোবাইল: ০১৭১১ ৩১১৩৬৬

সূচিপত্র

১.০ এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা ৫
১.১ এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৫
১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ নির্দেশনা ৫

২.০ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি) ৭
২.১ সিসিএজি কী? ৭
২.২ সিসিএজি-এর সদস্য বা অংশগ্রহণকারী/উপকারভোগী হওয়ার শর্তসমূহ ৮
২.৩ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল বা সিসিএজি গঠন প্রক্রিয়া ৮
২.৪ সিসিএজি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৮
২.৫ দলের কমিটির (সভাপতি, সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার) দায়িত্ব ৯
২.৬ গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) ৯

৩.০ আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা ১০
৩.১ আবহাওয়া ১০
৩.২ জলবায়ু ১০
৩.৩ গ্রীন হাউজ গ্যাস কি? ১২

৪.০ জলবায়ু পরিবর্তন ১৩
৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন ১৩
৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে বোঝা যায় ১৪
৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব ১৪

৫.০ অভিযোজন (এডাপটেশন) এবং প্রশমন (মিটিগেশন) সম্পর্কিত ধারণা ১৭
৫.১ অভিযোজন বলতে কি বুঝায় ১৭
৫.২ অভিযোজন কেন প্রয়োজন ১৮
৫.৩ প্রশমন (মিটিগেশন) ১৮

৬. বন্যা ১৯
৬.১ ভূমিকা ১৯
৬.২ বন্যার প্রকারভেদ ১৯
৬.৩ বন্যার সময় ও মেয়াদ ১৯
৬.৪ বন্যার সতর্কসংকেত (জানা অপরিহার্য) ২০
৬.৫ বন্যার প্রস্তুতিমূলক কাজ ২০
৬.৫.১ বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড ২০
৬.৫.২ বন্যাকালীন কাজ ২০
৬.৫.৩ বন্যা পরবর্তী কাজ ২০

৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার ২১
৭.১ বর্জ্য ২১
৭.২ গৃহস্থলী বর্জ্য ২১
৭.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ২১
৭.৪ বর্জ্য এর ব্যবহার ২১
৭.৪.১ জৈব সার ২১
৭.৫ কম্পোস্ট সার ব্যবহারের উপকারিতা ২২
৭.৬ কম্পোস্ট সার প্রস্তুত প্রণালী ২২
৭.৭ ঘরের আবর্জনা থেকে জৈব সার বা কম্পোস্ট সার তৈরি ২৩

৮. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান ২৪
৮.১ ভূমিকা ২৪
৮.২ পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ ২৪

৮.৩ পরিবেশ দূষণ রোধের উপায় ২৫
৯. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ২৬
৯.১ ভূমিকা ২৬
৯.২ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন ২৬
১০. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম ২৭
১১. বসতভিটা উঁচুকরণ ৩০
১২. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ৩৩
১২.১ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ৩৫
১৩. নলকূপ স্থাপন ৩৭
১৪. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ৪১
১৫. উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ ৪৪
১৬. উঁচু বসতভিটায় সবজি চাষ ৪৫
১৭. পুষ্টি ৪৯
১৭.১ পুষ্টি কী বা কাকে বলে এবং দৈনন্দিন পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা ৪৯
১৭.২ কয়েকটি পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের তালিকা ৫০
১৮. বসতবাড়ির বনায়ন ৫৩
১৮.১ একটি আদর্শ বসতবাড়ির বনায়ন স্থান পরিকল্পনা ৫৩
১৮.২ বসতবাড়িতে পরিকল্পিত কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা ৫৪
১৯. উঁচুকৃত বসতভিটায় ফল-ফলাদির গাছ রোপণ ৫৫
২০. দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৫৭
২০.১ দুর্যোগ ৫৭
২০.২ আপদ ৫৭
২০.৩ বিপদাপন্ন ৫৭
২০.৪ বিপদাপন্নতা ৫৭
২০.৫ দুর্যোগের প্রকারভেদ ৫৮
২০.৬ দুর্যোগ ও নারী ৫৮
২০.৭ দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কাজ ৫৮
২০.৭.১ দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড ৫৮
২০.৭.২ দুর্যোগকালীন কাজ ৫৮
২০.৭.৩ দুর্যোগ পরবর্তী কাজ ৫৮
২১. সামাজিক বিষয় ৫৯
২১.১ নৈতিক শিক্ষা ৫৯
২১.২ মূল্যবোধ ৬০
২১.৩ নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা ৬১
২১.৪ নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ অর্জনে করণীয় ৬১
২১.৫ যৌতুক কী ৬১
২১.৬ যৌতুকের শাস্তি ৬১
২১.৭ যৌতুকের কুফল ৬১
২১.৮ মাদকাসক্তির কুফল ৬২
২১.৯ কেন এই আসক্তি ৬২
২১.১০ মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিক ৬২
২২. পিকেএসএফ এর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ নিরসন ৬৩

১.০ এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্প কি? এর উদ্দেশ্য কী?

২. প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ নির্দেশনা।

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে এলাকার সমস্যাসমূহ আলোচনা করা এবং প্রকল্পের ধারণা সম্পর্কে জেনে নিন;
- প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ নির্দেশনা আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করুন

১.১ এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বন্যাপ্রবণ জনগোষ্ঠীর বন্যা মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ প্রকল্পের সদস্যসহ এলাকার জনগণের বন্যার সাথে খাপ খাইয়ে বা অভিযোজন করে স্বাভাবিক জীবনযাপন অব্যাহত রাখা। সর্বমোট চার (এপ্রিল ২০২০ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) বছর মেয়াদী প্রকল্পটি বন্যাপ্রবণ কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার ১১ টি উপজেলায় ০৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে ৯০,০০০ জন (২০,০০০ পরিবার) সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১,০০,০০০ জন উপকৃত হবে।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

ক. বসতভিটা উঁচুকরণ ও উঁচুকৃত ভিটায় ঘর মেরামতের জন্য ঋণ প্রদান।

খ. জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ।

গ. নিরাপদ খাবার পানির জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন ।

ঘ. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন এবং ছাগল/ভেড়া ক্রয়ে ঋণ প্রদান।

ঙ. বন্যা সহনশীল ফসল চাষ এবং

চ. উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ (মিষ্টি কুমড়া, ধান, গম, ভুট্টা, ফল ইত্যাদি)।

১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ নির্দেশনা

১. কোনো কার্যক্রম শুরুর পূর্বে অবশ্যই পিকেএসএফ-এর ECCCP-Flood প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হবে।

২. নির্দেশিকা বহির্ভূত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই পিকেএসএফ-এর ECCCP-Flood প্রকল্প ইউনিটের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

৩. ECCCP-Flood প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে উদ্দীষ্ট অংশগ্রহণকারী বাছাই করতে হবে।

৪. প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী বাছাই সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. ECCCP-Flood প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক দল গঠন করতে হবে। এর নাম হবে Climate Change Adaptation Group (CCAG)।

৬. ECCCP-Flood প্রকল্পের প্রতিটি কাজে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের নির্দেশনা মোতাবেক সাইনবোর্ড তৈরি করতে হবে।

৭. ECCCP-Flood প্রকল্প হতে নির্মিতব্য প্রতিটি অবকাঠামোর গায়ে লোগোসহ ECCCP-Flood, PKSF খোদাই করে বা টিনের প্লেটে লিখে অবকাঠামোর গায়ে সেঁটে দিতে হবে।

৮. যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মিতব্য অবকাঠামোর স্থায়িত্ব কমপক্ষে ১০ বছর হতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৯. যেসব পরিবার বিভিন্ন সংস্থা থেকে পূর্বে একই ধরণের সুবিধা পেয়েছে যা বর্তমানে দৃশ্যমান, সেসব পরিবার ECCCP-Flood থেকে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী হিসেবে বাছাইযোগ্য নয়।

১০. ECCCP-Flood প্রকল্প হতে প্রস্তাবিত কার্যক্রমকে কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনো প্রকল্প বা সংস্থার কার্যক্রমের সাথে মিল এবং দ্বৈততা থাকবে না এবং সদৃশ বা অনুরূপ করা যাবে না।

১১. একই ইউনিয়নে পিকেএসএফ-এর সমজাতীয় কোনো প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথেও দ্বৈততা এড়াতে হবে। বিশেষ করে যেসব ইউনিয়নে PPEPP (Prosperity) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান সেসব ইউনিয়ন ECCCP-Flood প্রকল্পের আওতাবহির্ভূত থাকবে।

১২. প্রত্যেক কাজ বাস্তবায়নে প্রদত্ত ক্রয় নির্দেশিকা অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১৩. ইসিসিসিপি-ফ্লাড (ECCCP-Flood) প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। তবে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংস্থার বা অংশগ্রহণকারীদের অনুদান থেকে অতিরিক্ত খরচ নির্বাহ করা যেতে পারে।

১৪. অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. প্রকল্প বাজেটে ঋণ বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ সহযোগী সংস্থার (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রাণিসম্পদ ক্রয় এবং উঁচুকৃত বসতভিটায় ঘর পুনঃনির্মাণের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

১৬. ইসিসিসিপি-ফ্লাড (ECCCP-Flood) প্রকল্পের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে পিকেএসএফ-এর বুনিয়াদী ঋণ নীতিমালা অনুসৃত হবে।

১৭. সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী পর্যায়ে অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সংস্থা প্রতি বরাদ্দের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

১৮. যে কোনো কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী অথবা কমিউনিটির সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

১৯. কোনো কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের বাজেট এই গাইডলাইনে বিবৃত বাজেট থেকে বেশি হলে তা অংশগ্রহণকারীকে প্রদান করতে হবে।

২০. প্রকল্পের শাখা অফিস ছাড়াও সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করতে হবে।

২১. বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পার্সন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করবেন এবং তার প্রতিবেদন পিকেএসএফ- এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে প্রদান করবেন।

২২. এ গাইডলাইনের কোনো ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিলে পিকেএসএফ-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রয়োজনে পিকেএসএফ এই গাইডলাইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন/সংযোজন/বিয়োজন করবে।

২৩. নগদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২৪. বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ নগদে মালামাল ক্রয়ে অংশগ্রহণকারীগণকে সহযোগিতা করবেন। এক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ধাপে কাজের গুণগতমান যাচাই নিশ্চিত করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীকে একাধিক কিস্তিতে অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

২৫. প্রকল্পে যে কোনো বিষয়ে আর্থিক অনিয়ম আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

২.০ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি)

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. সিসিএজি কী
২. সিসিএজি গঠনের উদ্দেশ্য
৩. সিসিএজি-এর সদস্য বা অংশগ্রহণকারী/উপকারভোগী হওয়ার শর্তসমূহ
৪. জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল বা সিসিএজি গঠন প্রক্রিয়া
৫. সিসিএজি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৬. দলের কমিটির (সভাপতি, সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার) দায়িত্ব
৭. গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) কী

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে সিসিএজি সম্পর্কে সদস্যদের ধারণা জেনে নিন;
- সিসিএজি গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- সিসিএজি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করুন

২.১ সিসিএজি কী?

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি) হলো এক্সটেনডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের একটি দল। এই দলের দায়িত্ব হলো প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দলের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক উন্নয়নে একে অপরের সহযোগিতা করা। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে কোনো সমস্যা মোকাবেলায় দলের সদস্য তথা এলাকার জনগণকে সহায়তা করা। প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি বা অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের ন্যায্যতা বা যৌক্তিক দাবিগুলো পুরণে সহায়তা করা।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (সিসিএজি) সদস্যরা নিয়মিত দলীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অভিযোজন, প্রশমন, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা, নৈতিক শিক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি, নিরাপদ পানি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচনা করবে এবং সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবে। এটি তাদের জন্য জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কে জানতে একটি তথ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

উদ্দেশ্য:

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা।
- দুর্যোগ মোকাবেলার মাধ্যমে কমিউনিটির সক্ষমতা তৈরি করা। এমন সক্ষমতা তৈরি করা যাতে করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে।
- যে কোনো ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঝুঁকি মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা তৈরি করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে কৃষিক্ষেত্র, খাদ্য নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানির সংস্থান, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো কমিউনিটির জীবন ও জীবিকার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দলের আলোচনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের

সাথে অভিযোজন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসের কৌশলগুলোকে জানানো এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

- জলবায়ু পরিবর্তনের যে কোনো সমস্যা এবং কীভাবে এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে দলের সদস্যদের অবহিত করা। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে দলীয় সদস্যদের অর্জিত জ্ঞান সমাজের অন্যান্য মানুষদের মধ্যে স্থানান্তর ও বিতরণ করা। সদস্যরা যাতে তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে পরিকল্পনা তৈরি করতে সেই লক্ষ্যে সহায়তা করা।
- সদস্যরা প্রকল্পের মেয়াদের পরেও কমিউনিটির অবকাঠামো উন্নয়নে এই জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সবাইকে উপকৃত করবেন।

২.২ সিসিএজি-এর সদস্য বা অংশগ্রহণকারী/উপকারভোগী হওয়ার শর্তসমূহ

১. নদীর চরাঞ্চল ও বন্যাপ্রবণ নীচু এলাকায় বসবাসকারী।

২. নারীপ্রধান পরিবার ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী সদস্যযুক্ত পরিবার।

৩. দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবার।

৪. দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের (১২৫ টাকা) কম।

৫. অন্য কোনো সংস্থা থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছে না।

২.৩ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল বা সিসিএজি গঠন প্রক্রিয়া

সিসিএজি গঠন করতে নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে

১) কমিউনিটি পর্যায়ে উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী থেকে প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী বাছাই করতে হবে।

২) উন্মুক্ত সভায় অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক মানচিত্র, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মানচিত্র এবং সম্পদের মানচিত্র প্রস্তুত করবে। এসবের আলোকে এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

৩) অংশগ্রহণকারী বাছাই-এর জন্য চিহ্নিত প্রত্যেক গ্রামে কমিউনিটির অংশগ্রহণে সম্পদ বিশ্লেষণ বা আর্থিক অবস্থা যাচাই সভা অয়োজন করতে হবে।

৪) কমিউনিটি পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা থেকে প্রস্তুতকৃত ১ম খসড়া তালিকা অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থার (IE) মাঠ কর্মকর্তা প্রতিটি বাড়িতে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রকৃত বাস্তবতা যাচাই করবেন এবং তার পর্যায়ে তালিকা ২য় খসড়া প্রস্তুত করবেন।

৫) মাঠ কর্মকর্তা থেকে প্রাপ্ত তালিকা বাস্তবায়নকারী সংস্থার (IE) প্রকল্প সমন্বয়কারী কমপক্ষে ৬০ শতাংশ যাচাই করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন।

৬) প্রকল্প সমন্বয়কারীর প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া তালিকা থেকে বাস্তবায়নকারি সংস্থার (IE) ফোকাল পার্সন কমপক্ষে ৩০ শতাংশ সরেজমিন যাচাইপূর্বক তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

৭) চূড়ান্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করে সংশোধিত চূড়ান্ত তালিকা পিকেএসএফ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৮) বাছাইকৃত অংশগ্রহণকারীদের/উপকারভোগীদের মধ্য হতে ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ২০-২৫ জনের সমন্বয়ে ১টি করে দল গঠন করতে হবে।

৯) দল গঠনের পর দলের মধ্য হতে সভাপতি, সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনে উপদল গঠন করতে হবে।

২.৪ সিসিএজি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

দলীয় সদস্যদের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তির উপযুক্ততা ইত্যাদি বিবেচনা করে পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযোজন কার্যক্রমে দলের সদস্যদের নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করতে হবে

১. দলীয় সদস্যরা নিয়মিত সভায় উপস্থিত হবে।

২. জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি ও তা নিরূপণের জন্য দলগুলোর সাথে মাসে কমপক্ষে একবার নিবিড় আলোচনা করতে হবে।

৩. স্থানীয় জলবায়ু অভিযোজন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪. নির্ধারিত বিষয়ে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
৫. কোন সদস্য কী ধরণের সুবিধা পাবে তা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।
৬. সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সকলে মিলে সমাধান করবে।
৭. যে কোনো ধরণের দূর্যোগ মোকাবেলায় দলের সদস্যসহ প্রতিবেশীদের সাহায্য করবে।
৮. সকল সদস্যকে সমহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

২.৫ দলের কমিটির (সভাপতি, সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার) দায়িত্ব

১. সভাপতি দলের নিয়মিত মাসিক সভা আহবান করবেন।
২. সেক্রেটারী সভার আয়োজন করবেন এবং সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
৩. সভার সময় ও আলোচনার বিষয়বস্তু কি হবে সভাপতি সেটা আগেই সভার সদস্যদের জানিয়ে দিবেন।
৪. প্রকল্প কর্মকর্তাদের সম্প্রচারকৃত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সময় সময় দলের সদস্যদের কে অবহিত করবেন।
৫. ক্যাশিয়ার দলের সদস্যদের অর্থ সঞ্চয়, জমা ইত্যাদি বিষয় দেখভাল করবেন।
৬. প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবে। আলোচনা এবং দলের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে।
৭. আলোচনার বিষয়বস্তু, গুরুত্বপূর্ণ দিক, ফলাফল ও সমাধান লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। একাজে সদস্যরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। সকল ধরণের সিদ্ধান্ত দলীয় খাতায়/রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৮. স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দলকে গতিশীল করতে হবে।
৯. কোথায়, কখন এবং কীভাবে সরকারি বা বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা পাওয়া যায় তা দলের নেতা ও অন্যান্য সদস্যদের জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১০. প্রকল্পের প্রতিটি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে হবে। কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
১১. সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সকলে মিলে সমাধান করতে হবে।
১২. যেকোনো ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় দলের সদস্যসহ প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে হবে।
১৩. সকল সদস্যকে সমহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

২.৬ গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) জাতিসংঘের এর আওতায় ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি তহবিল। এই তহবিল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য অর্থায়ন করে থাকে । পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) হতে অর্থ প্রাপ্তির জন্য কাজ করে।

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) নিম্লোক্ত দুটি কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে থাকে:

- ➢ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো সংক্রান্ত কাজে এবং
- ➢ গ্রীন হাউস গ্যাসের (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি) নির্গমণ হ্রাসকরণ সংক্রান্ত কাজে

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP- Flood) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট বাজেট ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটিতে জিসিএফ হতে ৯.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান এবং পিকেএসএফ কর্তৃক সহ-অর্থায়ন (ঋণ বাবদ) হিসেবে আছে ৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩.০ আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. আবহাওয়া কী? আবহাওয়ার উপাদানগুলো কী কী?
২. জলবায়ু কী?
৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য;
৪. গ্রীন হাউজ গ্যাস কি?

সময়ঃ ৯০ মিনিট

উপকরণঃ ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে আবহাওয়া, জলবায়ু কী সে সম্পর্কে সদস্যদের ধারণা সম্পর্কে জেনে নিন;
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন;
- গ্রীন হাউজ গ্যাস কি এ সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

৩.১ আবহাওয়া

আবহাওয়া হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানের ও নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা। যেমনঃ মেঘলা আকাশ, ভোরের কুয়াশা, ঝড় ইত্যাদি।

আবহাওয়ার উপাদান

- তাপমাত্রা
- বাতাসের চাপ
- মেঘাচ্ছন্নতা
- আপেক্ষিক আর্দ্রতা
- বৃষ্টিপাত
- কুয়াশা
- সৌরশক্তি

৩.২ জলবায়ু

জলবায়ু হলো দীর্ঘমেয়াদী (ন্যূনতম ৩০ বছর) এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গড় আবহাওয়ার ফলাফল। কোনো স্থানের আবহাওয়ায় যখন দীর্ঘ সময় ধরে (সাধারণত ৩০ বছর বা তার বেশি সময়ব্যাপী) ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। এই পরিবর্তনের ধারাটি কমপক্ষে ৩০ বছর হলে তা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন- পৌষ-মাঘ মাসের শীত পড়া, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিপাত হওয়া প্রভৃতি।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য

ক্রমিক নং	আবহাওয়া	জলবায়ু
১.	আবহাওয়া হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানের ও নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা। যেমন: মেঘের পরিমাণ, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি।	জলবায়ু হলো দীর্ঘমেয়াদী (ন্যূনতম ৩০ বছর) এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গড় আবহাওয়ার ফলাফল
২.	আবহাওয়া হলো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বায়ুমণ্ডলের তাৎক্ষনিক অবস্থা।	জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী গড় আবহাওয়া। যেমন- ● গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে, যার কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী নিম্ন অঞ্চল গুলো প্লাবিত হচ্ছে। ● বন্যার তীব্রতা ও ঘটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেছে। আবার একই সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হচ্ছে।
৩.	একটি স্থানের আবহাওয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বা এমনকি কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমনঃ ● হঠাৎ ঝড়োবাতাস প্রবাহিত হওয়া। ● রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কালো মেঘে বৃষ্টি হওয়া।	একটি স্থানের জলবায়ু পরিবর্তন হয় দীর্ঘ সময় ধরে (কমপক্ষে ৩০ বছর)।
৪.	আবহাওয়া স্বল্প সময়ের জন্য মূল্যায়ন করা হয়। যেমন-একটি দিন বা সপ্তাহের জন্য। আবহাওয়া বিভাগ তা নিয়মিত করে থাকে।	জলবায়ুর মূল্যায়ন করা হয় বহু বছর ধরে (সর্বনিম্ন ৩০ বছর)।
৫.	কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময়ে ভিন্ন হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রাজশাহীতে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু নাটোরে বৃষ্টি নাও হতে পারে।	কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম। যেমন- রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জলবায়ু একই রকম।

৩.৩ গ্রীন হাউজ গ্যাস কি?

কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস-অক্সাইড এই তিনটি গ্যাস হচ্ছে প্রধান গ্রীন হাউজ গ্যাস।

নিম্নলিখিত কারণে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়-

১. ইটের ভাঁটায় যে ধূঁয়া তৈরি হয় তা হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হয়।

২. কলকারখানার কালো ধূঁয়া হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হয়।

৩. মোটর গাড়ি, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টীমার, রেলগাড়ি ইত্যাদির ধূঁয়া হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হয়।

৪. উড়োজাহাজ, বিমান, রকেট, হেলিকপ্টার ইত্যাদির ধূঁয়া হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হয়।

৫. গরুর জাবর কাটা থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়।

৬. গোবর পচা থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়।

৭. কৃষি জমির বুদবুদ হতে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়।

৮. ইউরিয়া সার হতে নাইট্রাস অক্সাইড নির্গত হয়।

৯. অতিরিক্ত পরিমাণ বন ধ্বংস বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

১০. জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন- পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি) এর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি উৎপন্ন হচ্ছে।

১১. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বেশি উৎপন্ন হয়।

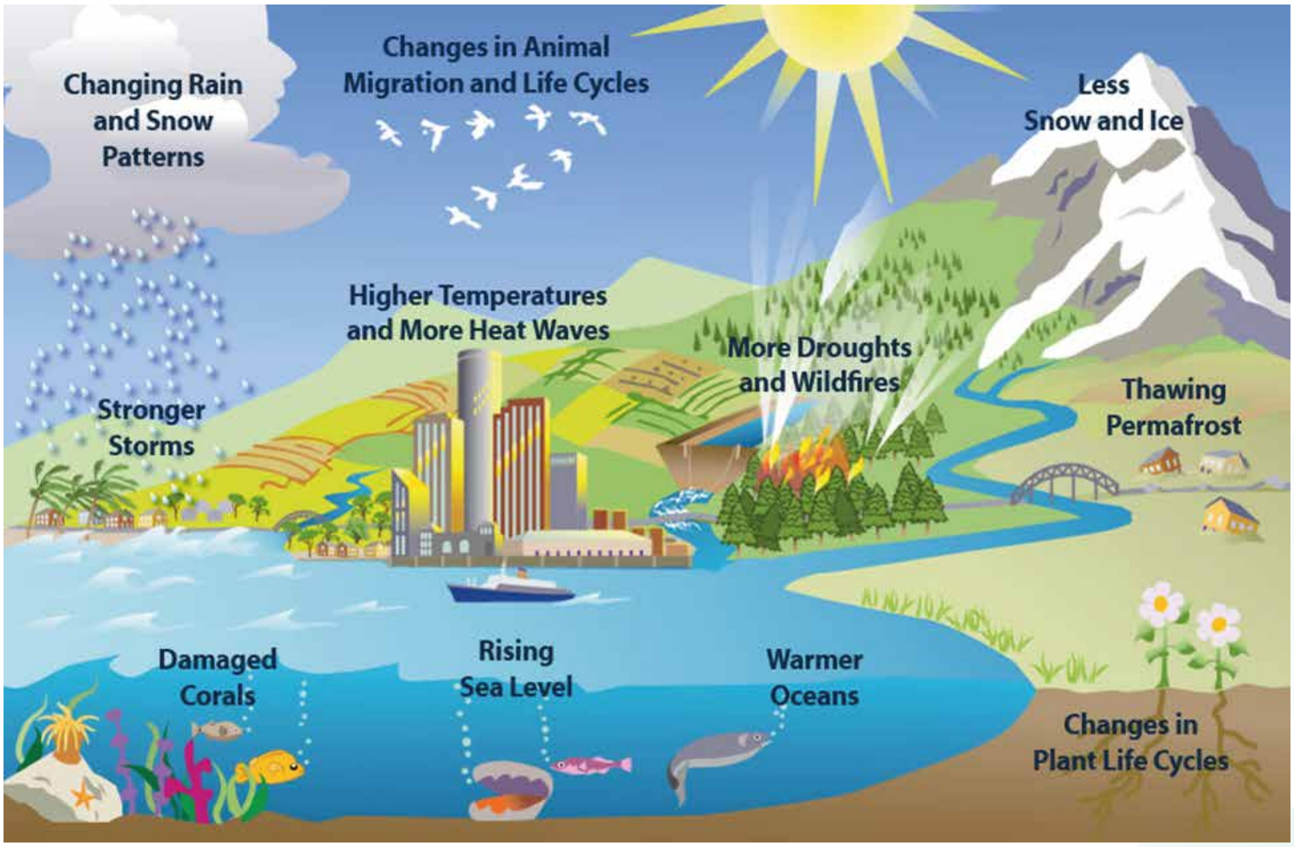

চিত্রঃ প্রকৃতির উপর গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাব

৪.০ জলবায়ু পরিবর্তন

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-
১. জলবায়ু পরিবর্তন কী? আবহাওয়ার উপাদানগুলো কী কী?
২. জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলো কী কী?
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কী ধরণের ক্ষতি হয়?
৪. জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বোঝা যায়?
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সদস্যদের ধারণা সম্পর্কে জেনে নিন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলো কী কী আলোচনা করুন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের কী ধরণের ক্ষতি হয় আলোচনা করুন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন

কোনো এলাকার গড় আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়।

প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ুতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু যে মাত্রায় এখন তাপমাত্রা বাড়ছে সে জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই প্রধানত দায়ী। মানুষ যখন থেকে কল-কারখানা এবং যানবাহন চালাতে বা শীতে ঘর গরম রাখতে তেল, গ্যাস এবং কয়লা পোড়াতে শুরু করলো তখন থেকে অর্থাৎ প্রায় ২০০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেও বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন বাড়ছে। গাছপালা কার্বন ডাই-অক্সাইড ধরে রাখে কিন্তু সেই গাছ যখন কাটা হয় বা পোড়ানো হয়, তখন কার্বন ডাই- অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ:

১. শিল্পায়নের উর্ধ্বগতি
২. অতিরিক্ত যানবাহন ও পরিবহন চলাচল
৩. তেল শোধানাগার হতে নির্গত ধুঁয়া
৪. কয়লা বা তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন
৫. বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস
৬. গবাদী পশুর খামার ব্যবস্থাপনা না থাকা
৭. আবদ্ধ পানি/জলাভূমি
৮. ধান চাষে ব্যবহৃত আবদ্ধ পানি হতে নির্গত গ্যাস
৯. অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ভোগ
১০. যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে যেসব ক্ষতি হয় তা হলো:

১. গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে
২. বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
৩. বন্যা
৪. অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে
৫. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লবণাক্ততা প্রবণ এলাকা বৃদ্ধিসহ মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে
৬. বঙ্গোপসাগরে বা উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমতল ভূমিতে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে
৭. বারবার ও অসময়ে ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে
৮. শীতের মেয়াদ কম এবং তীব্রতা বেশী হচ্ছে
৯. মিঠা বা স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদ কমে যাচ্ছে
১০. কৃষি ফসলের ফলন কম ও রোগবালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে
১১. বাসস্থান পানিতে ডুবে যায় এবং মানুষের কর্মসংস্থান কমে যায়
১২. খরা প্রবণ এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে
১৩. নদী-ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাচ্ছে
১৪. জীবনযাত্রার উপর প্রভাব
১৫. পানির উপর প্রভাব
১৬. অবকাঠামোর উপর প্রভাব
১৭. বাসস্থানের উপর প্রভাব
১৮. যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে বোঝা যায়

১. সময়ের বৃষ্টি অসময়ে হয়। অনাবৃষ্টি, আগের তুলনায় অল্প সময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাত, অত্যধিক তাপমাত্রা ও অত্যধিক শীত।
২. বন্যার সময়, সংখ্যা ও তীব্রতার পরিবর্তন
৩. ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় হওয়া
৪. শীতের পরিব্যাপ্তি হ্রাস
৫. শীত মৌসুমে বর্ষার মতো বৃষ্টি
৬. আমের মুকুল দেরিতে আসা
৭. ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমন বৃদ্ধি

৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আরও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ পাচ্ছে। আর তাতে হুমকির মুখে পড়ছে মানুষের জীবন ও জীবিকা। এখন তাপমাত্রা যদি আরও বাড়তে থাকে, অনেক এলাকায় চাষের ক্ষেত পরিণত হবে মরুভূমিতে। তার মানে সে সব এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। সবচেয়ে বেশি ভুগতে হবে গরিব দেশগুলোর মানুষকে, কারণ বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। উন্নয়নশীল অনেক দেশে এরই মধ্যে সেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকেই যাবে।

পানির উপর প্রভাব: জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির ব্যাপক অভাব দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশসহ সমুদ্রতীরের দেশগুলোতে সামনের দিনে মিঠা পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। লোনাপানির আগ্রাসনে উপকূলীয় এলাকায় দেখা দিচ্ছে সুপেয় পানির অভাব। আবার অত্যধিক বন্যার ফলে পানির অবকাঠামোগুলো পানিতে ডুবে পানির উৎস ধ্বংস হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ থেকে রাজকাঁকড়া, বনবিড়াল এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে খরা বা দীর্ঘস্থায়ী পানির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। নিয়মিত খরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরও চরম এবং আরও অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। খরার সময় খরাপীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কুয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে।

কৃষিখাতের উপর প্রভাব: বাংলাদেশের জীবিকা নির্বাহের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীল। মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সম্ভাব্য পানির উৎসকে শুকিয়ে ফেলতে পারে, যা কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের যোগান কমিয়ে দিলে গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার জন্য কৃষির অবদান কমে যেতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনে উপকূলীয় অঞ্চলে জীবিকার প্রধান উৎসগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। লোনাপানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয়গুলো ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি মাটির উর্বরতা হ্রাস করছে। এতে ফসল ফলন কমে যাচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষত নদ-নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অধিক পরিমাণ লোনাপানি প্রবেশ করে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় পরিবেশ সামগ্রিকভাবে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অত্যধিক লবণাক্ততার ফলে ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ব্যাহত হচ্ছে সঠিক সময়ে জমি চাষ, বীজ বপন, ফসল পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ইতোমধ্যে সুন্দরবনের ভেতরে অবস্থিত সুপেয় পানির কিছু উৎসে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়েছে যার প্রভাবে সেখানে যে সব আবাদি জমি ছিল তাতে ফসল উৎপাদন আগের চেয়ে অনেকটাই ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট খরার ফলে নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদিপশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বড় সমস্যা।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বর্ষা মৌসুম শুরুর সময় এবং শুরুর আগে যে বৃষ্টিপাত হতো তার পরিমাণ কমে গেলেও বর্ষা মৌসুম, বিলম্বিত বর্ষা এবং বর্ষা মৌসুমের শেষদিকে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেছে। এমনকি শীত মৌসুমে বর্ষার মতো বৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি আঘাত হানে। তন্মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমিধসের মাত্রা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। আগে ১৫ কিংবা ২০ বছর পরপর বড় ধরণের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও বর্তমানে অস্বাভাবিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তা প্রত্যেক বছরে হানা দিচ্ছে। এছাড়া ঘন ঘন বন্যা, অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নদী বিধৌত অঞ্চলে বন্যা ও নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাসস্থান: কোনো একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানে জলবায়ুর পরিবর্তন ওই বাসস্থানের প্রজাতির বণ্টনকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্র এলাকাবর্তী স্থানে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে মানুষ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। এছাড়া নদী ও চর এলাকার অধিবাসীরা বন্যার পানির বৃদ্ধির ফলে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

জীবন ও জীবিকা: প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর উপজীবিকারা তাদের জীবিকা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ছে। এতে দেশের বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। যেমন-মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্বাদু পানির জেলে, সমুদ্রগামী জেলে এবং মোহনাগামী জেলে তাদের জীবিকার উৎস হারাচ্ছে। বর্তমানে এরকম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে প্রায় এক লাখেরও বেশি জেলে।

ঘন ঘন বন্যা বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা মানুষের কাজের সুযোগ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও জলোচ্ছ্বাসে ধুয়ে নিয়ে যায় উপকূলবর্তী মানুষের একমাত্র সহায় গবাদি পশু, ফসল ও ফসলের জমি। অনেক প্রান্তিক চাষী ঋণ করে জন্মানো ফসল হারিয়ে হয়ে পড়ে নিঃসম্বল। এর ফলে উপকূলীয় এলাকার লোকেরা শহরমুখী হচ্ছে এবং শহরে সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

- ফসলের উৎপাদন হ্রাসের পাশাপাশি সময়মতো পরবর্তী ফসল ফলানো কঠিন হয়ে পড়ছে।
- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়সহ অনেক ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। এতে একদিকে ফসলের ফসলচক্র ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষি জমি হারাচ্ছে চাষের স্বাভাবিক উপযুক্ততা, উর্বরা শক্তি।
- স্থানীয় গ্রামীণ জনপদ বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকরা সক্ষমতা হারাবে। ফলে কৃষির বর্তমান অবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

অবকাঠামোগত ক্ষতি : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ফলে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তা, সেতু এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেশিরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদী, হ্রদ এবং শহরগুলিতে ভারী বর্ষনের ফলে সংগঠিত বন্যা, ঘরবাড়ি ও সম্পদের, এবং রাস্তা ও সেতুর ক্ষতি ইত্যাদি অবকাঠামোগত ঘটনা রয়েছে। তাছাড়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সড়ক, রেললাইন এবং বিমানবন্দরের রানওয়ের মতো পরিবহন অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

লবণাক্ততাজনিত অবকাঠামোর ক্ষতি: বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ-নদীর পানিপ্রবাহ শুকনো মৌসুমে স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে না। ফলে নদীর পানির চাপের কারণে সমুদ্রের লোনাপানি যতটুকু এলাকা জুড়ে আটকে থাকার কথা ততটুকু থাকে না, পানির প্রবাহ কম থাকার কারণে সমুদ্রের লোনাপানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসে ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যায়। এই লবণ পানির সংস্পর্শে লোহা, টিন, কাঠসহ কোন কোনো উপকরণই টেকসই হয় না। ফলে ঘরবাড়ি, রাস্তা ও সেতুসহ সকল অবকাঠামোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেকেই কৃষি জমি হারাবে। বাংলাদেশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা প্রভৃতির প্রভাবে কিছু জমিতে সাময়িক উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। বন্যা, খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এর কারণে ফসল উৎপাদনসহ মৎস্য ও পশুসম্পদ খাত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন রোগ-জীবাণু ছড়াবে যা জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। এ ধরণের দুর্যোগের পরে নানাবিধ রোগ যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, চর্মসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ বেড়ে যাবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো অনেক প্রাণঘাতী রোগ-জীবাণুও সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুপেয় পানির উৎস কমে যাওয়ায় লবণাক্ত পানি পান করে উপকূলীয় মানুষ উচ্চ রক্তচাপ, এক্লামশিয়াসহ বিভিন্ন রকম পেটের পীড়ায় ভুগছে।

সুপেয় পানি: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষি জমি ইতিমধ্যেই লবণাক্ততার শিকার হয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ ১৮% এ পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি বৃদ্ধি বাংলাদেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে এবং সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হবে। অনাবৃষ্টির ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সুপেয় পানির অভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায়ও ভূ-গর্ভস্থ পানি কমে যাচ্ছে। রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নেমে যাচ্ছে পানির স্তর। লোনা পানির আগ্রাসনে উপকূলীয় এলাকায় দেখা যাচ্ছে সুপেয় পানরি তীব্র সংকট। এছাড়াও বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যা ও পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ী ঢলের কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা যাচ্ছে।

কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ : বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা, স্বল্প বা অধিক তাপমাত্রা কৃষির উৎপাদন ব্যাহত করবে এবং যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পূর্বের মতো দেশীয় মাছ আর পাওয়া যায় না। মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদটি আজ আর সেভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের আবাসস্থল, খাদ্য সংগ্রহ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় বিঘ্নিত ঘটে। ৩২° সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা হলে অনেক মাছও মরে যেতে পারে। এছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা রোগ-জীবাণু জন্মাতে সহায়তা করায় মাছের রোগ প্রবনতা বেড়ে গিয়ে প্রজাতি হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাপমাত্রা ২৯-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেলে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায় ফলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় আর তাতে প্রজননক্ষম মাছ অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় ডিমের আবরণ পাতলা হয়ে যায়। এতে সমগ্র পোনা উৎপাদন ব্যাহত হয়। এছাড়াও অসময়ে কুয়াশা, আকাশ মেঘলা থাকাও মাছ চাষকে ব্যাহত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাছের খাবার ও আশ্রয়স্থল কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্বাদু পানির মাছ চাষে লোনা পানি ঢুকে পড়ে বাধাগ্রস্থ করছে মাছ চাষ। জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি পালন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বড় ধরনের জলোচ্ছাসের পর গবাদি পশুর শুকনো খাদ্যরে আকালে পড়ছে। লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ঘাস উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এছাড়াও তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গৃহপালিত পশুর বিভিন্ন রোগ বেড়ে যাচ্ছে।

সামগ্রিক প্রভাবঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হন। নারীরা এমনিতেই অরক্ষিত থাকেন। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তাঁরা আরও বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়েন। বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য ও নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ব্যর্থতা তাঁদের আরও ঝুঁকির মুখে ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুহারা মানুষ অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এখনো এ বিষয়টি নারীদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। যখন কোথাও নদীভাঙন দেখা দেয়, তখন ওই এলাকার পুরুষেরা কাজের সন্ধানে শহরে চলে যায়। পরিবারের অন্য সদস্যদের দেখভাল করার জন্য নারীরা এলাকাতেই থেকে যায়। ঘরের কাজ ছাড়াও তাঁদের পুরুষদের কাজগুলোও করতে হয়। আমাদের দেশে বহু সাইক্লোন শেল্টার বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে। কিন্তু সেগুলো নারীবান্ধব নয়। ওই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। এগুলো নারীর জন্য বড় ধরণের বিপদ হয়ে দেখা দেয়। নারী ও পুরুষ একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকার ফলে কখনো কখনো কিশোরী ও নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হতে পারেন। খরা বা সাইক্লোনের মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির অর্থ হল এতে আক্রান্ত পরিবারগুলো আরও বেশি দরিদ্র হচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবারগুলো যখন ঘরবাড়ি হারাচ্ছে, তখন সেই পরিবারের শিশুরা অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো কাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে শিশুদের নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। দায়িত্ব নিতে না পেরে মেয়ে শিশুদের অনেক পরিবার দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও সাইক্লোন, বন্যার মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সময় বৃদ্ধ, পঙ্গু এমন মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায় বিধায় তারা মানসিকভাবে হেয় হন।

৫.০ অভিযোজন (এডাপটেশন) এবং প্রশমন (মিটিগেশন) সম্পর্কিত ধারণা

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. অভিযোজন বলতে কি বুঝায় এবং উদাহরণ
২. অভিযোজন কেন প্রয়োজন?
৩. প্রশমন (মিটিগেশন) কী?
৪. প্রশমন কেন দরকার?
৫. প্রশমন এর প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ।

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কে সদস্যদের ধারণা সম্পর্কে জেনে নিন;
- অভিযোজন কেন প্রয়োজন আলোচনা করুন;
- প্রশমন কেন দরকার আলোচনা করুন;
- প্রশমন এর প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

৫.১ অভিযোজন বলতে কি বুঝায়

অভিযোজন বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতিতে খাপ-খাওয়ানোকে বুঝায়। সহজভাবে বলা চলে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ-খাওয়ানো বা মানিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করা হলো অভিযোজন।

উদাহরণ

১. বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যা থেকে বাঁচার জন্য বসতবাড়ি উঁচুকরণ।
২. বন্যাসহনশীল ফসল চাষকরণ।
৩. খাঁচায় মাছ চাষ করা।
৪. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন।
৫. ভাসমান ধাপে সবজি চাষ।
৬. বসতভিটার চারপাশে বৃক্ষরোপণ।
৭. বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৮. উপকূলীয় বন সৃষ্টি।
৯. স্বল্পমেয়াদী, আগাম বা নাবী ফসল চাষ করা।
১০. নলকূপ, ল্যাট্রিন উঁচুস্থানে স্থাপন করা।
১১. বিকল্প আয়ের বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৫.২ অভিযোজন কেন প্রয়োজন?

১. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য
২. কৃষি উৎপাদন অব্যহত রাখা
৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সচল রাখা
৪. জান ও মালের নিরাপত্তা রক্ষা করা

৫.৩ প্রশমন (মিটিগেশন)

গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য গৃহীত কার্যক্রমই প্রশমন।

নিম্নোক্তভাবে প্রশমন কার্য সম্পন্ন করা যেতে পারেঃ

১. গ্রীনহাউজ গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি) নিঃসরণ কমানো।
২. জীবাশ্ম জ্বালানী যেমন- কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল জ্বালানী ব্যবহার কমানো।
৩. সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৪. ঘরবাড়ি ও অফিস আদালতে উন্নতমানের জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতি। যেমন- সিএফএল বাতির ব্যবহার বাড়ানো।
৫. অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক বাতি ও গ্যাসের চুলা না জ্বালিয়ে রাখা।
৬. উন্নত চুলা বা বন্ধু চুলা স্থাপন বাড়ানো।
৭. সঠিকভাবে পূর্নঃব্যবহার করে বর্জ্যের পরিমাণ কমানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। যেমন- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন।
৮. বন ধ্বংস থেকে বিরত থাকা।
৯. বৃক্ষ রোপন করা।
১০ গোবর ও গো-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
১১. ধানের জমিতে পানি ব্যবস্থাপনা (AWD)।
১২. গুটি ইউরিয়া, ভার্মি কম্পোস্ট ও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার।

চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কর্মকাণ্ড

৬. বন্যা

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. বন্যা কী ও এর প্রকারভেদ
২. বন্যার সময় ও মেয়াদ
৩. বন্যার সতর্ক সংকেত
৪. বন্যার প্রস্তুতিমূলক কাজ

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে বন্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা সম্পর্কে জেনে নিন;
- বন্যা কী ও এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন;
- বন্যার সময় ও মেয়াদ আলোচনা করুন;
- বন্যার সতর্ক সংকেত আলোচনা করুন;
- বন্যার প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

৬.১ ভূমিকা

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে যখন নদী, খাল, বিল, হাওর ও নিচু এলাকা পানিতে ভেসে যায় এবং ফসল, ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, সহায়-সম্পত্তির ক্ষতি হয় তখন তাকে বন্যা বলে। নদীর তলদেশে পলি জমার কারণে নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল হওয়ায় এবং পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে বন্যা দেখা দেয়। এছাড়াও পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি বৃষ্টিপাতের কারণে হঠাৎ বন্যা দেখা যায়।

৬.২ বন্যার প্রকারভেদ

১. মৌসুমী বন্যা
২. আকস্মিক (পাহাড়ী ঢল) বন্যা
৩. অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা এবং
৪. উপকূলীয় বন্যা

মৌসুমী বন্যা: মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে নদ-নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি কারণে যে বন্যা হয়।

আকস্মিক বন্যা: বাংলাদেশের উত্তরের কিছু এলাকা, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে সংলগ্ন পাহাড়ী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পানির উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। একই সাথে পানি প্রবাহের গতিবেগ বেশি হয়, বন্যা হয় স্বল্পমেয়াদী।

অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা: ভারী বা মাঝারী বৃষ্টিপাতের দরুণ কোনো কোনো এলাকা বন্যা কবলিত হয়, এই প্রকার বন্যা কবলিত এলাকার পানির উচ্চতা খুব ধীর গতিতে হ্রাস পায় এবং বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

উপকূলীয় বন্যা: ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা হয়ে থাকে।

৬.৩ বন্যার সময় ও মেয়াদ

সাধারণত বাংলা মাসের আষাঢ় থেকে আশ্বিন বা মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্যা হয়।

৬.৪ বন্যার সতর্ক সংকেত (জানা অপরিহার্য)

১. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি হলে অর্থাৎ এক নাগাড়ে ৮-১০ দিন ভারি বৃষ্টি হলে বুঝতে হবে খুব শিগগিরই বন্যা হবে, তাই বন্যা মোকাবিলার পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।
২. বাড়ির কাছাকাছি নদী ও বিলের পানি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, দেখতে হবে প্রতিদিন কী পরিমাণ পানি বাড়ছে।
৩. দ্রুত পানি বাড়তে থাকলে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।
৪. প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত বন্যা-সম্পর্কিত যাবতীয় খবর শুনতে হবে।

৬.৫ বন্যার প্রস্তুতিমূলক কাজ

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে যে কাজগুলো করা হয় তাকে বন্যার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড বলে। তিন পর্যায়ে এ প্রস্তুতি নেওয়া হয়, যথা : বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, বন্যাকালীন কাজ এবং বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে করণীয়।

৬.৫.১ বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড

১. বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো হচ্ছে বন্যার আগে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বাড়ির ভিটা উঁচু করা।
২. বাড়ির চারপাশ দিয়ে কলাগাছ, ঢোলকলমি, ধইঞ্চা, বাঁশ ইত্যাদি বন্যা মোকাবিলায় সহায়ক গাছ লাগানো।
৩. সঞ্চয় করা।
৪. বন্যার পানি আসার আগেই আলগা চুলা তৈরি করা ও জ্বালানি সংগ্রহ করে উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে শুকনো খাবার চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা।
৫. বন্যা আসার আগেই বাড়ির স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করা, যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়।
৬. বাড়ির গোয়ালঘর ও হাঁস-মুরগির ঘর উঁচু করে তৈরি করা।
৭. ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা।
৮. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খাবার সংরক্ষণ করা, বন্যা আসার আগেই গবাদিপশু-পাখিকে প্রতিষেধক টিকা দেয়া।
৯. প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা।
১০. বন্যা আসার আগেই ডায়রিয়া প্রতিরোধে কার্যকর খাবার স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় তা জেনে রাখা।
১১. বন্যাকালীন সময়ে গর্ভবতীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে বন্যার পানি আসার আগেই তাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে ।
১২. ছোট ছেলেমেয়েদের বন্যা আসার আগেই সাঁতার শেখাতে হবে।
১৩. বন্যার পানি আসার আগেই এলাকার আশপাশের উঁচু স্থানগুলো কোথায় তা চিহ্নিত করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত বন্যায় সেসব স্থানে আশ্রয় নেয়া যায়।

৬.৫.২ বন্যাকালীন কাজ

১. বন্যাকালীন সময়ে নিয়মিত পানি বৃদ্ধির খবর জানার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিপদের সংবাদ সবাইকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।
২. প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া।
৩. নিরাপদ আশ্রয় গমনে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৪. নিরাপদ পানি সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।
৫. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিওদের নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে।
৬. নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.৫.৩ বন্যা পরবর্তী কাজ

১. বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে, নোংরা আবর্জনা মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
২. অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত বর্ধনশীল শাকসবজির চাষ করতে হবে।
৩. বন্যার পর সরকারি-বেসরকারি পুনর্বাসন-সুবিধা সম্বন্ধে জানা ও তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
৪. বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া নলকূপ সংস্কার করতে হবে।
৫. বন্যা-পরবর্তী সময়ে মানুষ (দুই বছরের নিচের শিশু ব্যতীত) ও গবাদিপশুকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. বর্জ্য কী ও এর প্রকারভেদ
২. গৃহস্থলী বর্জ্য কী?
৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা যায়?
৪. বর্জ্য এর ব্যবহার
৫. জৈব সার কী?
৬. পিট কম্পোস্ট সার উৎপাদন প্রযুক্তি
৭. কম্পোস্ট সার ব্যবহারের উপকারিতা
৮. কম্পোস্ট সার প্রস্তুত প্রণালী
৯. ঘরের আবর্জনা থেকে জৈব সার বা কম্পোস্ট সার তৈরি

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে বর্জ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- বর্জ্য কী ও এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন;
- গৃহস্থলী বর্জ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- জৈব সার ও কম্পোস্ট সার সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা;

৭.১ বর্জ্য

বিভিন্ন উৎস থেকে আসা যেসব পদার্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে না, বা উচ্ছিক অংশ তাকে বর্জ্য বলে। যেমন- আমাদের প্রতিদিনের রান্নার ফলে উৎপন্ন শাকসবজি-তরিতরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট, পলিথিন, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি।

৭.২ গৃহস্থলি বর্জ্য

আমাদের প্রতিদিনের রান্নার ফলে যে শাকসবজি-তরি–তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি উৎপন্ন হয় তা, কিংবা পলিথিন, কাগজের প্যাকেট, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি সবই গৃহস্থালি বর্জ্য। অর্থাৎ যে সব বর্জ্য আমাদের ঘরে উৎপন্ন হয় তাই গৃহস্থালি বর্জ্য।

৭.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনঃব্যবহার (Reuse) এবং নিষ্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। আমাদের প্রতিদিনের উৎপন্ন আবর্জনা যেমন- শাকসবজি-তরি-তরকারির খোসা, মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট, পলিথিন, কাগজের প্যাকেট প্রভৃতি সংগ্রহ, নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া, পরিশোধন করা সবকিছু মিলেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

৭.৪ বর্জ্য এর ব্যবহার

৭.৪.১ জৈব সার

জৈব সার হচ্ছে সেসব সার যা কোনো জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ বা গাছপালা বা প্রাণির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রস্তুত করা যায়। যেমন- গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি।

৭.৪.১.১ পিট কম্পোস্ট সার উৎপাদন প্রযুক্তি

গবাদি পশুর খামার এর বর্জ্য, মল-মূত্র, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা পচনের মাধ্যমে এই কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়।

৭.৫ কম্পোস্ট সার ব্যবহারের উপকারিতা

১. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও মাটির গুণাগুন উন্নত হয়।
২. মাটির পানি/রস ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৩. মাটির বায়ু চলাচল বেড়ে যায় ও মাটির উপকারী জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যায়।
৪. গ্রীষ্মকালে মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে।
৫. রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট মাটির দূষণ কমায়।

৭.৬ কম্পোস্ট সার প্রস্তুত প্রণালী

কম্পোস্ট হলো স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রাপ্ত জৈব সার যা স্থানীয়ভাবে সহজেই সংগ্রহযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার জৈব উপকরণ দ্বারা এ সার প্রস্তুত করা হয়। উপকরণের উপর ভিত্তি করে সার তৈরিতে দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে পচে যাওয়ার পর কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুইটি পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা যায়, যথা- গর্ত পদ্ধতি ও স্তুপ পদ্ধতি।

বাংলাদেশে বেশিরভাগই পিট বা গর্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান দুটি অসুবিধা হলো প্রথমত সময় বেশি লাগে, দ্বিতীয়ত সরাসরি কাঁচা মাটিতে গর্ত করলে বেশির ভাগ পুষ্টি উপাদান গর্তে ও চারিধারের মাটি শোষণ করে। অপরদিকে হিপ বা স্তুপ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট প্রস্তুত করা যায়।

স্তুপ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী এর আকার ও আয়তন কম বেশি হতে পারে। তবে চওড়ায় ৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৫ ফুট হওয়া প্রয়োজন। এধরণের স্তুপে একাধিক প্রকোষ্ঠ বা খোপ থাকা ভালো। সর্বনিম্ন স্তরে এক ফুট খামার এর আবর্জনার স্তর (ঘাস পাতা, খাবার উচ্ছিষ্টাংশ) দিতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরে আধাফুট উৎকৃষ্ট মানের মাটি ও গোবর/লিটার সারের মিশ্রণ দিতে হয়। যদি সম্ভব হয়, তবে কম্পোস্ট স্তুপটি একটি ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যদি তা না হয়, তবে অন্তত এমন কিছু দিয়ে ঢাকতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পায়। কিছুদিনের মধ্যে স্তুপের ভিতরের দিকে খুব গরম হতে থাকবে তখন বোঝা যাবে উপকরণগুলি পচতে শুরু করেছে। একে বেশি শুকানো বা ভেজা রাখা যাবে না। সম্পূর্ণরূপে পচে না যাওয়া পর্যন্ত উপকরণগুলি প্রতি সপ্তাহে একবার করে একই বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে ওলট পালট করে দিতে হবে। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে উর্বর কালো মাটির মত কম্পোস্ট তৈরি হবে।

চিত্র: স্তুপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরী

৭.৭ ঘরের আবর্জনা থেকে জৈব সার বা কম্পোস্ট সার তৈরি

১. শাকসবজি বা ফলের অবশিষ্টাংশ, ঘাস লতাপাতা, অব্যবহৃত কাঠের ব্রাশ, চা বা কফির ফেলে দেয়া গুড়ো, ঘুঁণে ধরার ফলে সৃষ্ট কাঠের গুঁড়ো, গৃহপালিত পশুর বর্জ্য, এসব দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে কম্পোস্ট সার। শুধু ঘাস-লতাপাতা, সবজি বা ফলমূলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে কিংবা একটি ঝুড়িতে রেখে দিতে হবে। এটার জন্য আর কোনো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সার তৈরি হতে কয়েক মাস, এমনকি বছরও লেগে যেতে পারে। তবে যাদের বাড়িতে আবর্জনার পরিমাণ কম, যারা মিশ্র সার তৈরিতে খুব বেশি সময় ব্যয় করতে পারবেন না, তাদের জন্য এই পদ্ধতি খুব কাজে দিবে। দিনে একবার কম্পোস্ট সারের জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলোকে নেড়ে দিতে হবে।

২. এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে গর্ত করে আবর্জনা স্তূপাকারে রেখে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। স্তূপ এর সাথে চাইলে কিছু মাটিও মিশিয়ে দেয়া যাবে। এতে আবর্জনার পচন দ্রুত হবে। কারণ, মাটিতে এমন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা বিভিন্ন জৈব পদার্থকে দ্রুত পচিয়ে দিতে পারে। আবর্জনার স্তূপটিতে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে পানি দিতে হবে যেন সার তৈরির উপাদানগুলো আর্দ্র থাকে, কিন্তু ভিজে চুপচুপে না হয়ে যায়। কারণ, এতে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে। যখন আবর্জনাগুলো পচে যেতে থাকবে তখন সেখান থেকে তাপ উৎপাদিত হবে। তাই মাঝে মাঝে আবর্জনার স্তূপ নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে এক থেকে তিন মাসের মাঝে ঘরের আবর্জনা থেকে তৈরি করা যাবে কম্পোস্ট বা জৈব সার।

চিত্রঃ গর্তে সার তৈরী

৮. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত প্রাথামিক জ্ঞান

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. পরিবেশ দূষণ কী?
২. পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ।
৩. পরিবেশ দূষণ রোধের উপায়।

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- ➢ কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- ➢ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- ➢ পরিবেশ দূষণ কী আলোচনা করুন;
- ➢ পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- ➢ পরিবেশ দূষণ রোধের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- ➢ উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- ➢ সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

৮.১ ভূমিকা

সাধারণ ভাবে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষ, গাছ-পালা, পশুপাখি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট ইত্যাদি সব কিছুই পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত।

পরিবেশের এসব উপাদান যেমন- বাতাস, পানি ও মাটির ভৌত, রাসায়নিক কিংবা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন যা কোনো কাঙ্খিত জীব, প্রজাতি বা মানবের জীবন ও বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাকেই পরিবেশ দূষণ বলে। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন হয় তাই পরিবেশ দূষণ।

৮.২ পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ

১. শব্দ দূষণ :
- উচ্চ শব্দে হর্ণ বাজানো
- কলকারখানার ও নির্মাণ কাজের সৃষ্ট শব্দ

২. বায়ু দূষণ:
- যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া
- কলকারখানার দূষিত বর্জ্য ও ধোঁয়া
- ইট ভাটায় নির্গত ধোঁয়া
- নির্বিচারে গাছ কাটা

৩. পানি দূষণ:
- কৃষি কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার
- কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি যেখানে সেখানে ফেলা।
- দূষিত পানি খাল, বিল, নদী বা পুকুরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া
- পুকুরের পানিতে গরু-ছাগল গোসল করানো
- পুকুরের পানিতে কাপড় ধোয়া
- খোলাস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি
- যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা

৪. মাটি দূষণ:

- কৃষি কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার
- যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা
- কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি যেখানে সেখানে ফেলা।

৮.৩ পরিবেশ দূষণ রোধের উপায়

- পরিমিত রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার করা
- জৈব সার ব্যবহার করা- ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট ও গোবর সার
- কলকারখানার ময়লা আবর্জনা ও দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা
- নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা
- বৃক্ষরোপণ করা
- পরিবেশ এর ক্ষতি হয় এমন কার্যক্রম সংঘটিত না করা
- ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

চিত্র: পরিবেশ দূষণ

৯. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কী?
২. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন।
৩. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কী এবং কীভাবে করা যায়?

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- ➢ কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- ➢ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও আইপিএম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- ➢ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কী আলোচনা করুন;
- ➢ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- ➢ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কী এবং কীভাবে করা যায় বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- ➢ উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- ➢ সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা;

৯.১ ভূমিকা

আমাদের প্রতিদিন এর কাজের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা থেকে পরিবেশকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য যেসব কাজ করা হয় তাই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। যেমন-গোবর থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নক্‌শা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন ও তৎপরবর্তী সকল স্তরের কর্মকাণ্ডসমূহের পরিবেশগত প্রভাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে, যাতে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

৯.২ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন

১. পরিবেশের দূষণ কমানো
২. স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো
৩. জমির উর্বরতা রক্ষা করা
৪. পানির দূষণ কমানো
৫. প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা
৬. প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করা
৭. পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন চলমান রাখা
৮. পরিবেশ দূষণ ও অবনমন নিয়ন্ত্রণ করা

১০. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম কী?
২. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা-এর উপকারিতাসমূহ কী কী?
৩. অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহারের কুফলসমূহ কী কী?

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও আইপিএম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম কী আলোচনা করুন;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা-এর উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহারের কুফলসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- সমিন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কী এবং কীভাবে করা যায় বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

চিত্র: ফেরোমন ফাঁদ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কি ?

আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে প্রয়োজনে এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগবালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতিসীমার নিচে রাখাকে বোঝায়, যাতে করে পরিবেশ দূষিত না হয়।

১. হাত জালের সাহায্যে পোকা ধরে মারা।
২. আলোর ফাঁদে পোকা ধরা।
৩. আক্রান্ত পাতার আগা কেটে দেওয়া।
৪. পাখি বসার জন্য ডাল পুঁতা।
৫. হাত দিয়ে পোকার ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
৬. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কেবল আক্রান্ত জমিতে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়, সঠিক মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা।

আইপিএম-এর উপকারিতা কি কি ?

১. আইপিএম গ্রহণের ফলে উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশু, পাখি ও গুই সাপ প্রভৃতি সংরক্ষণ করা যায়।
২. ক্ষতিকারক কীটনাশকের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, যথেচ্ছ ব্যবহার না হওয়ায় উৎপাদন খরচ কমে।
৩. বালাইনাশকের পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়। এতে করে বালাইনাশকজনিত দুর্ঘটনা সহজেই এড়ানো যায়।
৪. ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় বালাইনাশক সহনশীলতা অর্জন করার সুযোগ পায় না।
৫. বালাই-এর পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম।
৬. সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

অতিরিক্ত রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকসমূহ

মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কুফল মারাত্মক। এর ফলে পানি, মাটি ও বায়ু দূষিত হয়। বহু উপকারি প্রাণী বিপন্ন হয়ে পড়ে।

১. নানা চর্মরোগ
২. কিডনির বৈকল্য
৩. লিভারের নানা রোগ
৪. টিউমার
৫. নানা ধরণের ক্যানসার
৬. লিউকিমিয়া
৭. মহিলাদের স্তন ক্যান্সার
৮. নানান স্নায়ুরোগ
৯. হরমোনের ভারসাম্য ব্যাহত হওয়া
১০. জন্মগত বিকলাঙ্গতা।

মনে রাখতে হবে

১. উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণ করতে হবে
২. বালাই সহনশীল জাতের চাষাবাদ করতে হবে
৩. আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে
৪. যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে
৫. নিয়মিতভাবে অপকারী ও উপকারী পোকামাকড়ের উপস্থিতি জরিপ করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. বালাইনাশক ব্যবহার করার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
৭. বালাইনাশক ব্যবহার করার সময় পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
৮. বালাইনাশক নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে যেন শিশুরা খুঁজে না পায়।
৯. বালাইনাশক ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে।

আইপিএম

ফসলের জমিতে পাখি বসার পাচিং ব্যবস্থা করতে হবে

হাত জাল দিয়ে ক্ষতিকর পোকা ধরে নিধন করতে হবে

হলুদ ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে

আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে

জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে

সর্বশেষ সঠিক মাত্রা ও পদ্ধতিতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার

১১. বসতভিটা উঁচুকরণ

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. বসতভিটা উঁচুকরণ কেন দরকার?
২. বসতভিটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে
৩. উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
৪. বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- ➢ কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- ➢ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে বসতভিটার উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- ➢ বসতভিটা কিভাবে বাস্তবায়ন কৌশল বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করুন;
- ➢ উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কী তা আলোচনা করুন;
- ➢ উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- ➢ সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

বসতভিটা উঁচুকরণ কেন দরকার	উপকারভোগী কারা
১. ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ২. জলবায়ুজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা অন্যতম। ৩. নদী বিধৌত বাংলাদেশে বন্যা একটি সাধারণ বিষয় হলেও জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে বর্তমানে বন্যার ধরণ, তীব্রতা এবং সংঘটনমাত্রা পরিবর্তন হচ্ছে। ৪. ফলে বন্যায় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যহত হচ্ছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ৫. নিম্ন অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের বাড়ি-ঘর প্রায়শই পানিতে ডুবে যায় তারা এই ঝুঁকির সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। ৬. এই ধরণের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই প্রাকৃতিক বিপদের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বসতভিটা উঁচুকরণ করা দরকার।	১. যে সকল মানুষ নদীবেষ্টিত চর ও নিচু এলাকায় বসবাস করে। ২. দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবার সদস্য (যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম)। ৩. মহিলা প্রধান পরিবার বা যে পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে তবে অবশ্যই উপরের দুটি (১ ও ২) বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ৪. যাদের কমপক্ষে ১২০ বর্গমিটার বা ২.৫ শতক নিজস্ব বা লিজকৃত জমি আছে। ৫. যাদের নিজস্ব অর্থায়নে বসতভিটা উঁচুকরণের সামর্থ্য নেই। ৬. যারা ইতোপূর্বে অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যক্তির কাছ থেকে একই ধরণের সুবিধা পায়নি।

বাস্তবায়ন কৌশল

১. বসতভিটা উঁচুকরণের সকল কাজ গুচ্ছভিত্তিক হবে। প্রতিটি গুচ্ছে কমপক্ষে ৩-৪ টি বাড়ি থাকতে হবে।

২. ভিটা উঁচুকরণের ক্ষেত্রে জমির দলিল/পর্চা বা দাখিলা অথবা জমির মালিক বা প্রতিনিধিদের থেকে একটি লিখিত অঙ্গীকার করে নিতে হবে যাতে ১০ বছরের মধ্যে জমির মালিক কোনোভাবেই সুবিধাভোগীকে তাড়িয়ে দিতে না পারে।

৩. গুচ্ছাকারে ভিটা উঁচুকরণে বাড়ির মধ্যখানে খোলা রাখতে হবে যাতে করে ভিটার খোলা অংশ বা উঠান সকলে ব্যবহার করতে পারে।

৪. বসতভিটায় অবস্থিত সকল ঘরের ক্ষেত্রফলের কমপক্ষে দ্বিগুণ জায়গা বসতভিটা উঁচুকরণের জন্য নির্বাচিত হবে।

৫. উঁচুকৃত বসতভিটায় অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, সবজি চাষ ও গবাদীপশু পালনে স্থান সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে।

৬. ঢালের মাপ কমপক্ষে ১ঃ১.৫ হবে অর্থাৎ উচ্চতা ১ ফুট হলে পাশে ১.৫ ফুট হবে।

মনে রাখতে হবে

১. বাড়ির ভিটা উঁচু করার ক্ষেত্রে প্রতি ২ ফুট উচ্চতার পর দশ (১০") ইঞ্চি করে স্টেপ বা খাজ রাখতে হবে।

২. ঘরের ভিটা উঁচু করার ক্ষেত্রে প্রতি ১ ফুট উচ্চতার পর পাঁচ (৫") ইঞ্চি স্টেপ রাখতে হবে। ঘরের ভিটা উঁচুকরণের সময় ঘরের মেঝে থেকে ১ ফুট নিচে পলিথিন কাগজ বিছিয়ে দিতে হবে।

৩. ঘরের ভিটার চারিপাশে ২-৩ ইঞ্চি সিমেন্ট-মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে।

৪. ভিটা উঁচুকরণের পর ঢালের চারিদিকে দুর্বাঘাস লাগাতে হবে। দুর্বাঘাস অবশ্যই দেড় থেকে দুই ইঞ্চি গভীর করে মাটিসহ কেটে এনে ঢালের উপর রোপণ করতে হবে।

৫. এছাড়াও ঢালের উপর বাঁশ, কলাগাছ, নারিকেল গাছ, খেজুর গাছ সহ অন্যান্য গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

৬. দুর্বাঘাস লাগানোর পর নিয়মিত পানি দিয়ে পরিচর্যা করতে হবে।

৭. প্রতি বছর বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর ভিটার ঢালের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ উক্ত ভিটায় বসবাসকারী উপকারভোগীকে নিজ উদ্যোগে মেরামত করতে হবে।

চিত্র: উঁচকৃত বসতভিটা

বসতভিটা উঁচুকরণ

বসতভিটার চারপাশে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগাতে হবে

বসতভিটার ঢালে খাঁজ কাটা সিড়ি থাকতে হবে

বসতভিটার ঢালে প্রচুর ফল/কাঠের গাছ লাগাতে হবে

গুচ্ছাকারে বসতভিটা উঁচু করতে হবে।

বসতভিটার পর্যাপ্ত পরিমাণ ঢাল রাখতে হবে

বসতভিটার ঢালে নেপিয়ার/প্যারা ঘাস লাগাতে হবে

১২. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন কেন দরকার?
২. উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
৩. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে?
৪. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে?
৫. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন;
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কেন দরকার	সুবিধাভোগী কারা
১. প্রতিবছর বন্যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার উপযোগী থাকছে না। ২. বন্যা এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে মানুষ খোলা পায়খানা ব্যবহার করছে। ৩. খোলা পায়খানা ব্যবহার করার ফলে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে মশা-মাছির কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দিচ্ছে, মল হতে দুর্গন্ধ বের হয়ে পরিবেশ দূষণ করছে। ৪. পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের মতো মৌলিক সুবিধা থেকে দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছে। ৫. অস্বাস্থ্যকর পায়খানার কারণে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রায়ই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। ৬. এমনিতে অত্র এলাকার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, তার ওপর চিকিৎসা খাতে অতিরিক্ত খরচের কারণে দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে চিকিৎসাজনিত খরচের মাত্রা কমাতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা দরকার।	১. যে সকল মানুষ নদীবেষ্টিত চর ও নিচু এলাকায় বসবাস করে । ২. দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবার সদস্য (যাদের যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম)। ৩. মহিলা প্রধান পরিবার বা যে পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে তবে অবশ্যই উপরের দুটি (১ ও ২) বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ৪. যাদের কমপক্ষে ১২০ বর্গমিটার বা ২.৫ শতক নিজস্ব বা লিজকৃত জমি আছে। ৫. যাদের নিজস্ব অর্থায়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন সামর্থ্য নেই। ৬. ইতোপূর্বে যাদের বসতভিটা উঁচুকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ৭. তিন পরিবার মিলে যারা কন্ট্রিবিউশন প্রদানে সম্মত।

বাস্তবায়ন কৌশল	মনে রাখতে হবে
১. জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ক্ষেত্রে ECCCP-Flood কর্তৃক সরবরাহকৃত নকশা অনুসরণ করতে হবে। ২. জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান হবে বাড়ির খুব কাছে যেখানে বাড়ির মহিলা ও শিশুরা সহজে সকল সময় (দিনে ও রাতে) সহজে যাতায়াত করতে পারে। ৩. ল্যাট্রিনের কুয়া এবং টিউবওয়েলের মধ্যে দূরত্ব কমপক্ষে ৩০ ফুট রাখতে হবে। ৪. কোনো জলাশয় বা খালের সাথে ল্যাট্রিনের কুয়ার সংযোগ দেয়া যাবে না। ৫. ল্যাট্রিনের ওয়াটারসিল কোনো অবস্থাতেই ভেঙে ফেলা যাবে না। ৬. ল্যাট্রিনের মাপ হবে ভিতরের অংশের ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি-৫ফুট ১০ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৭ ফুট। ৭. নতুন তোলা মাটিতে ল্যাট্রিন স্থাপন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে মাটির কমপ্যাকশন (Compaction) নিশ্চিত করার জন্য অন্তত একটি বর্ষাকাল অতিবাহিত করতে দিতে হবে। ৮. সোকওয়েলের পাইপে ২টি পিটের সংযোগ থাকতে হবে।	১. ল্যাট্রিন পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দায়িত্বশীল হতে হবে। তিন পরিবার মিলে নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। ২. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চারটি বৈশিষ্ট্য যেমন- ক. মল দেখা যাবে না, খ. মশা-মাছি ঢুকবে না, গ. দুর্গন্ধ হবে না এবং ঘ. পরিবেশ দূষণ করবে না- অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখবে। ৩. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ওয়াটারসিল কোনো অবস্থাতেই ভেঙে ফেলা যাবে না। ৪. ল্যাট্রিনে সবসময় পর্যাপ্ত পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ৫. ল্যাট্রিন নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে মাছির উপদ্রব না হয়। ৬. ল্যাট্রিনের কুয়ার ঢাকনা কোনো অবস্থাতেই খোলা রাখা যাবে না ৭. ল্যাট্রিনের কুয়া ভরে গেলে সাবধানতার সাথে তা পরিষ্কার করতে হবে যেন কুয়াটি ভেঙ্গে না যায়।

চিত্র: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

১২.১ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

১. পরিবারের প্রতিটি সদস্য প্রদত্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২. পায়খানা ব্যবহারের সময় অবশ্যই স্যান্ডেল পায়ে দিতে হবে।

৩. পায়খানা ব্যবহারের পর পর্যাপ্ত পানি ঢালতে হবে।

৪. পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান পানি দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে।

৫. যদি সাবান না থাকে তাহলে ছাই দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে।

৬. পায়খানায় স্থাপিত পানির পাত্রটি সবসময় পানিপূর্ণ করে রাখতে হবে।

৭. পানির পাত্রটি সব সময় ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার পরিস্কার করতে হবে।

৮. পায়খানা ব্যবহারের পর দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে।

৯. পায়খানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরিবারের সকল সদস্যের সমান অধিকার থাকবে। কোনো অবস্থাতেই কোনো একটি পরিবারের আওতায় রাখা যাবে না।

১০. পায়খানার ওয়াটার সীল কখনও ভেঙ্গে ফেলা যাবে না।

১১. পায়খানার কুয়ার ঢাকনা কোনো অবস্থায় খোলা রাখা যাবে না।

১২. পায়খানার কুয়া/সোকওয়েল ভরে গেলে সাবধানতার সাথে তা পরিস্কার করতে হবে যেন কুয়াটি ভেঙ্গে না যায়।

১৩. কোনো জলাশয় বা খালের সাথে পায়খানার কুয়ার সংযোগ দেয়া যাবে না।

১৪. পরিষ্কারকৃত বর্জ্য কোনোভাবেই উন্মুক্ত জলাশয়ে ফেলা যাবে না। অবশ্যই মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

১৫. অতি বৃষ্টির কারণে পায়খানা স্থাপনের মাটিতে কোনো ফাটল অথবা ছিদ্র দেখা দিলে মাটি/বালি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

১৬. পায়খানা চালায়/দেয়ালে কোনো সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৭. ঘুর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস দেখা দিলে পায়খানার দরজা শক্ত করে আটকিয়ে রাখতে হবে যেন প্রবল বাতাসে ভেঙ্গে বা উড়ে না যায়।

১৮. পায়খানা ব্যবহারের জন্য বাড়ির মহিলা, বৃদ্ধ/বৃদ্ধা ও শিশুরা সহজে ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করতে হবে।

১৯. খেয়াল রাখতে হবে যেন শিশুরা খেলার ছলে পায়খানার মধ্যে কোনো কিছু না ফেলে।

২০. কোনোভাবেই ব্যবহৃত স্যানিটারি সামগ্রী/টিস্যু স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার প্যানের মধ্যে ফেলা যাবে না।

২১. পায়খানা পরিস্কার রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ সকল পরিবার মিলে সম্পন্ন করতে হবে।

২২. পায়খানা সর্ব অবস্থায় পরিস্কার রাখতে হবে।

২৩. সর্বোপরি সকলকে মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার চারটি বৈশিষ্ট্য যেমন:

ক. মল দেখা যাবে না

খ. মশা-মাছি ঢুকবে না

গ. দুর্গন্ধ হবে না এবং

ঘ. পরিবেশ দূষণ করবে না- অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখবে।

উঁচুকৃত বসতভিটায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন

পায়খানার আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে

পায়খানার ভিতর পরিষ্কার রাখতে হবে

পায়খানার ভিতরে পাত্র ভর্তি পানি এবং সাবান রাখতে হবে

পায়খানার প্যান পরিষ্কার রাখতে হবে

নলকূপ ও পায়খানার দূরত্ব কমপক্ষে ৩০ফিট হতে হবে

ব্যবহারের পর দরজা বন্ধ রাখতে হবে

১৩. নলকূপ স্থাপন

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. নিরাপদ পানি কী?
২. নিরাপদ পানির বৈশিষ্ট্য;
৩. নিরাপদ পানির উৎস;
৪. নিরাপদ পানির গুরুত্ব;
৫. দুর্যোগকালিন নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৬. বন্যা পূর্ব সময়ে নিরাপদ পানি সংরক্ষণের উপায়;
৭. নলকূপ কেন দরকার?
৮. উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য;
৯. নলকূপ কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে;
১০. নলকূপ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে;

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে নিরাপদ পানি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- নিরাপদ পানির উৎস, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- দুর্যোগকালিন নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- বন্যা পূর্ব সময়ে নিরাপদ পানি সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- নলকূপ উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন;
- নলকূপ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

চিত্র: কমিউনিটি টিউবওয়েল

নলকূপ কেন দরকার

১. নিরাপদ পানির নিশ্চিত করার জন্য।
২. দূষিত পানিতে বিভিন্ন ধরণের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি।
৩. বন্যার সময় নিরাপদ পানি/সুপেয় পানি নিশ্চিত করা যায়।
৪. বন্যার শেষে পানি কমতে শুরু করলে পানিতে ময়লা-আবর্জনায় নানা ধরণের রোগ যেমন-ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, চর্মরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। উক্ত সময় নলকূপের পানি ব্যবহার করলে এধরণের রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৫. নীচু স্থানে নলকূপ স্থাপনে বন্যার সময় নলকূপের মধ্যে দূষিত পানি ঢুকে পানের অযোগ্য হয়ে যায়। এজন্য উঁচু জায়গা নলকূপ স্থাপন করলে পানি দূষণের সম্ভাবনা কম থাকে।
৬. বন্যার সময় বা বন্যা পরবর্তী সময়ে নিরাপদ পানির সংকট মোকাবেলায় নলকূপ স্থাপন দরকার।

সুবিধাভোগী কারা

১. যে সকল মানুষ নদীবেষ্টিত চর ও নিচু এলাকায় বসবাস করে।
২. দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবার (যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম) সদস্য।
৩. মহিলা প্রধান পরিবার বা যে পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে তবে অবশ্যই উপরের দুটি (১ ও ২) বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।
৪. যাদের নিজস্ব অর্থায়নে নলকূপ স্থাপনের সামর্থ্য নাই।
৫. যাদের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুযোগ কম।
৬. কমিউনিটির সকল সদস্য

বাস্তবায়ন কৌশল

১. নলকূপ স্থাপন কার্যক্রমটি কমিউনিটিভিত্তিক হতে হবে।
২. কমিউনিটির সাথে আলোচনা করে নলকূপ স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করতে হবে যেন সকলেই তা সহজে ব্যবহার করতে পারে।
৩. ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা নির্বাচন করতে হবে যেন একটি নলকূপ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবার পানি সংগ্রহ করতে পারে।
৪. নলকূপ স্থাপনের পূর্বে সবচেয়ে নিকটস্থ অন্য একটি নলকূপের পানির আর্সেনিকের মাত্রা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে যেন তা সহনীয় মাত্রায় থাকে।
৫. নলকূপের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সমান অধিকার থাকবে।
৬. উঁচুকৃত বসতভিটা অথবা এমন উঁচু জায়গায় নলকূপ স্থাপন করতে হবে যেন কোনোভাবেই বন্যায় প্লাবিত না হয়।
৭. প্লাটফরমের আকার হবে ৫ ফুট x ৬ ফুট।
৮. সোকওয়েল এর গভীরতা হবে ৩ ফুট যা আরসিসি রিং দিয়ে তৈরি হবে। নিচের রিং অর্ধেক মোটা বালি ও অর্ধেক বড় খোয়া দিয়ে ভরে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট পাড়া/গ্রামের পুরুষসহ মহিলাদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।
২. নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমবায়ভিত্তিক উপকারভোগীদের দলীয় একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
৩. এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তুলতে হবে এবং এই কমিটির কাছে নলকূপের মালিকানা হস্তান্তর করা যেতে পারে।
৪. কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকবেন যিনি নলকূপের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন।
৫. গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানি বিভিন্ন ডোবা-নালায় নিষ্কাশিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন জমে থেকে যাতে মশা-মাছি সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য কৈ, মাগুর, শিং, টাকি প্রভৃতি দেশি প্রজাতির মাছের চাষ করা যেতে পারে।

উঁচুকৃত বসতভিটায় নলকূপ স্থাপন

সবুজ রং চিহ্নিত টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকমুক্ত, নিরাপদ

লাল রং চিহ্নিত টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত

পরিষ্কার পাত্রে পানি পান করা

খাওয়ার আগে হাত সাবান দিয়ে ভালোমতো ধোয়া

টিউবওয়েলের আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব

টিউবওয়েলের আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব

নিরাপদ পানি

যে পানিতে ময়লা, আবর্জনা, রোগজীবাণু থাকেনা তাকে নিরাপদ পানি বলে।

নিরাপদ পানির বৈশিষ্ট্য

নিরাপদ পানির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

১. নিরাপদ পানি সবধরণের জীবাণুমুক্ত হবে
২. পানির রং বর্ণহীন হবে
৩. কোনো প্রকার দুর্গন্ধ বা ভাসমান পদার্থ থাকবে না
৪. পানি খুবই স্বচ্ছ হবে

নিরাপদ পানির উৎস

নিরাপদ পানির উৎসগুলো নিম্নরূপ-

১. বোতলে প্রক্রিয়াজাত করা পানি ফুটানো পানি
২. ফিল্টার করা পানি
৩. নলকূপের পানি
৪. বৃষ্টির পানি

নিরাপদ পানির গুরুত্ব

পানির অপর নাম জীবন। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ পানির গুরুত্ব আপরিসীম।

দুর্যোগকালিন নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

দুর্যোগকালিন নিরাপদ পানির ব্যবহার নিম্নলিখিত উপায়ে নিশ্চিত করা যায়-

১. ফুটিয়ে পানি পান করতে হবে
২. বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে
৩. পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে

বন্যা পূর্ব সময়ে নিরাপদ পানি সংরক্ষণের উপায়

১. উঁচুস্থানে টিউবওয়েল স্থাপন করতে হবে
২. পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সংগ্রহে রাখতে হবে

১৪. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কেন দরকার?
২. উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
৩. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে
৪. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন;
- মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

মাঁচা পদ্ধতি কেন দরকার	সুবিধাভোগী কারা
১. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন লাভজনক না হওয়ায়। ২. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে। ৩. প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের চেয়ে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন করলে রোগ-ব্যাধি কম হওয়ায়। ৪. ছাগলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে ফলে খামারি বেশি লাভবান হয়। ৫. মাচার উপরে ছাগল/ভেড়া স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে, মলমূত্রের সাথে মাখামাখি হয় না এবং সেখান থেকে উৎপাদিত গ্যাস দ্বারা ছাগল/ভেড়া আক্রান্ত হয় না। ৬. ছাগলের বাচ্চা মৃত্যুহার একেবারেই কমে যায়। ৭. নিমোনিয়া, পিপিআর রোগ কম হয়।	১. দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবার (যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম)। ২. যাদের ছাগল/ভেড়া পালনের কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৩. মহিলা প্রধান পরিবার যাদের পরিবারে অক্ষম (Disable) সদস্য আছে তাঁদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৪. যাদের চাষযোগ্য কৃষি জমি নেই। ৫. যে সকল পরিবারের বড় আকারের কোনো আইজিএ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ৬. যাদের ছাগল/ভেড়া পালনে আগ্রহ রয়েছে।

বাস্তবায়ন কৌশল	মনে রাখতে হবে
১. ECCCP-Flood প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে। ২. ক্লাস্টার অনুযায়ী ছাগল/ভেড়া পালনের উপকারভোগী নির্বাচন ও মাঁচা প্রদান করতে হবে। ৩. ছাগল/ভেড়া পালনে শুধু মাঁচা তৈরির খরচ প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। ৪. কমপক্ষে প্রতিটি উপকারভোগীর দুইটি মা ছাগল/ভেড়া থাকতে হবে। ৫. ছাগলের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতকে প্রাধান্য দিতে হবে । ৬. গাইড লাইনের নকশা অনুযায়ী ঘর তৈরি করতে হবে। ৭. ক্যাম্পেইন-এর মাধ্যমে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সকল ছাগল/ভেড়ার টিকা প্রদান করতে হবে। ৮. ছাগল/ভেড়া পালনে প্রতিটি সুবিধাভোগীকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	১. ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গাতে ছাগল রাখা যাবে না। ২. ECCCP-Flood প্রকল্পে শুধু মাত্র মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন করা যাবে। ৩. রোগাক্রান্ত ছাগল অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে। ৪. রোগ দেখা দেয়ার আগেই সুস্থ্য ছাগলকে পিপিআর রোগের টিকা দিতে হবে। ৫. টিকার সিডিউল অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। এতে অধিক সময়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। ৬. ছাগল পিপিআর রোগে মারা গেলে অবশ্যই দূরে কোথাও গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। ৭. পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ছাগলকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। ৮. কোনোভাবেই প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মা ছাগল/ভেড়া বিক্রি করা যাবেনা।

চিত্র: মাচাঁ পদ্ধতিতে ছাগল পালন

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন

চিত্র: মাচাঁ পদ্ধতিতে ছাগল বা ভেড়া পালনের বিভিন্ন চিত্র

১৫. উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. উচ্চ মূল্যের ফসল কী ও কেন চাষাবাদ করা দরকার
২. উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
৩. উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে
৪. উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন;
- উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ কেন দরকার	**সুবিধাভোগী কারা**
১. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে উচ্চ ফলন দেয় ও প্রচলিত ফসলের চেয়ে অধিক মূল্য পাওয়া যায়। ২. অল্প সময়ে ফলন দেয়। ৩. বন্যা বা খরা মোকাবেলা করে সঠিক ফলন দিতে পারে। ৪. অল্প জায়গায় আবাদ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। ৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি কাটিয়ে অল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা যায়। ৬. জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। ৭. বাংলাদেশ সরকার উচ্চমূল্যের ফসল চাষে জনগণকে উৎসাহিত করছে।	১. দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবার (যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম)। ২. যে সকল কৃষক আগ্রহী এবং নিজেই আবাদের সাথে সরাসরি জড়িত। ৩. ছোট ও মাঝারি ধরণের কৃষক যাদের নিজের অথবা লিজকৃত আবাদি জমির পরিমাণ কমপক্ষে ৩৩ শতক। ৪. একই এলাকায় পাশাপাশি কৃষকের জমিতে চাষ করতে হবে। তবে একজন কৃষকের এক বিঘার (৩৩ শতাংশ) বেশি জমি নেয়া যাবে না। ৫. ছোট ও মাঝারি ধরণের কৃষক যাদের উচ্চ মূল্যের ফসল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে। ৬. উচ্চাকাঙ্খা আছে এমন কৃষক।
উচ্চ মূল্যের ফসল কি	**মনে রাখতে হবে**
১. যে সকল ফসল চাষ করে অল্প সময়ে কৃষকরা অধিক মুনাফা অর্জন বা লাভবান হয় সে সকল ফসলকে উচ্চমূল্যের ফসল বলে। ২. আমাদের দেশে বেশকিছু উচ্চমূল্যের ফসল ইতোমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যেমনঃ জাফরান, সূর্যডিম আম, কাজুবাদাম, স্ট্রবেরী, লেটুস পাতা, চায়না শাক, বিট রুট, ব্রোকলি, লাল বাঁধাকপি, স্কোয়াস, ফ্রান্সবিন, সুইট কর্ন, থাই আদা, লেমনগ্রাস, টমেটো, ড্রাগন ফ্রুট ইত্যাদি।	১. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ফসলের উপর বালাই ও আগাছার প্রভাব পড়তে পারে। ২. বর্ধিত পোকা এবং নতুন রোগের রোগ সংবেদনশীল বা অকার্যকর কীটনাশক বিশেষ অপকারী প্রভাব ফেলতে পারে। ৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ফসলের নতুন রোগ, পোকামাকড় প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে, যা পূর্বে দেখা যায়নি।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া যখন সাধারণ ফসল চাষ করে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তখন উচ্চমূল্যের ফসল কৃষককে স্বপ্ন দেখাচ্ছে।	৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফুল ধারণের সময়, ফুল-ফলের সংখ্যা, বর্ণ ও আকার পরিবর্তন হতে পারে। ৫. বন্যাপ্রবণ এলাকায় স্থানীয় ও উফশী জাতের আগাম পাকা ও স্বল্প মেয়াদের বোরো চাষাবাদ ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে। ৬. অবশ্যই রোগ ও পোকামাকড় দমনে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

উচ্চ মূল্যের ফসল

জাফরান

সূর্যডিম আম

লেটুস

কাজুবাদাম

উচ্চমূল্যের শাকসবজি

স্ট্রবেরী

১৬. উঁচু বসতভিটায় সবজি চাষ

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. উচুকৃত বসভিটায় কেন সবজি আবাদ করা দরকার?
২. উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য;
৩. উচুকৃত বসভিটায় সবজি আবাদ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে?
৪. উচুকৃত বসভিটায় সবজি আবাদ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে উচুকৃত বসভিটায় সবজি

আবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন-

- উপকারভোগী কারা হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন;
- উচুকৃত বসভিটায় সবজি আবাদ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

উঁচুকৃত বসতভিটায় সবজি চাষ কেন দরকার	সুবিধাভোগী কারা
১. বসতবাড়ি বাগান পরিবারের সদস্যদের নিকট পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফলমূল সহজলভ্য করে। ২. সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি আবাদের ফলে শাক-সবজি খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের যোগান নিশ্চিত করে। ৩. বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা অন্যান্য খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে পারে। ৪. রাতকানা রোগসহ বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে মা ও শিশু কিশোরদের রক্ষা করে। ৫. পতিত জমি সর্বোত্তম ব্যবহার হয়।	১. দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবার (যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম)। ২. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠি যাদের কিছুটা শাক-সবজির চাষের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী যাদের চাষযোগ্য কৃষি জমি নেই। ৪. যাদের বসতবাড়িতে কিছুটা শাক-সবজির চাষের উপযোগী জায়গা আছে। ৫. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের শাক-সবজির চাষের আগ্রহ রয়েছে। ৬. যাদের বসতভিটা ইতোমধ্যে উঁচুকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

সবজিচাষের জন্য বেড ও মাদা তৈরি পদ্ধতি	মনে রাখতে হবে
সবজি চাষের জন্য বেড তৈরি ১. পর্যাপ্ত চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও ঢেলামুক্ত করতে হবে। ২. চাষের গভীরতা ২৫-৩০ সেমি (প্রায় ১ফুট) হওয়া প্রয়োজন। ৩. জমির আগাছা শেকড়সহ বাছাই করে বেড তৈরি করতে হবে। ৪. বেড তৈরির সময় জমিতে জৈব সার যেমন- পচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার বেডের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ৫. বেডের প্রস্থ ৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য জমির আকারের সাথে মিল রেখে করতে হবে। **সবজি চাষের জন্য মাদা তৈরি** ৬. ১.৫ হাত×১.৫ হাত×১.৫ হাত মাপের গর্ত তৈরি করতে হবে। ৭. গর্তের মাটি তুলে গর্তের পাশে রেখে দিতে হবে এবং ৩ঃ১ অনুপাতে মাটি ও গোবর/কম্পোস্ট সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। ৮. গর্ত করে মাদা তৈরি করে তার চার দিকে সুন্দর করে বেড়া দিতে হবে।	১. বেড পদ্ধতিতে চাষ করা হয় কপি গোত্রের বিভিন্ন সবজি (বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, ফুলকপি) এবং আলু, টমেটো, মুলা, লালশাক, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, ডাঁটা ইত্যাদি। ২. মাদা পদ্ধতিতে চাষ করা হয় কুমড়া জাতীয় সবজি (চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, শিম, বরবটি, লাউ, চিচিঙ্গা, ঝিংগা ইত্যাদি সবজি)। ৩. শীতকালীন বা রবি সবজিঃ যে সকল সবজি শীতকালে (অক্টোবর-মার্চ) চাষ করা হয় তাদেরকে শীতকালীন বা রবি সবজি বলা হয়। কপি গোত্রের বিভিন্ন সবজি (বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, ফুলকপি) এবং আলু, টমেটো, শিম, বরবটি, লাউ, মুলা, লালশাক ইত্যাদি। ৪. গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ সবজিঃ যে সকল সবজি গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) চাষ করা হয় সেগুলোকে গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ সবজি বলা হয়। কুমড়া জাতীয় সবজি (চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া), ঢেঁড়স, পুঁইশাক, ডাঁটা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। ৫. উভয়-মৌসুমি সবজিঃ বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়স, লালশাক, কলমিশাক, পেঁপে ইত্যাদি। ৬. অবশ্যই রোগ ও পোকামাকড় দমনে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। ৭. নিয়মিত সেচ প্রদান ও আগাছা হলে নিড়ানী দিতে হবে।

চিত্রঃ বসতভিটায় সবজি চাষ

উঁচুকৃত বসতভিটায় সবজিচাষ

মাঁদা পদ্ধতিতে বারোমাসি লাউ

বেড পদ্ধতিতে বিভিন্ন সবজি

ঘরের চালে ঝিংগা

আদর্শ বেড

ঝাড় পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন

ঘরের চালে চালকুমড়া

১৭. পুষ্টি

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. পুষ্টি কী বা কাকে বলে এবং দৈনন্দিন পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা
২. শর্করা জাতীয় খাদ্যের সহজ উৎস
৩. আমিষ জাতীয় খাদ্যের সহজ উৎস
৪. স্নেহ জাতীয় খাদ্যের সহজ উৎস
৫. ভিটামিনের সহজ উৎস
৬. মিনারেল বা খনিজ পদার্থের সহজ উৎস
৭. কয়েকটি পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের তালিকা

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে পুষ্টি কী বা কাকে বলে এবং দৈনন্দিন পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ খাদ্যের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

১৭.১ পুষ্টি কী বা কাকে বলে এবং দৈনন্দিন পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা

পুষ্টি হলো একটি প্রক্রিয়া, যেই প্রক্রিয়ায় শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য পরিবেশ থেকে খাদ্যবস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে শারীরিক শক্তির চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা হয়। এক কথায় বলতে গেলে শরীরকে সচল রাখার প্রক্রিয়াই হলো পুষ্টি যা খাদ্য হতে আসে।

পুষ্টির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, যেমনঃ বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন (ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি ইত্যাদি), খনিজ লবণ, প্রোটিন বা আমিষ, শর্করা ইত্যাদি। রঙিন ফলমূল ও শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ লবণ রয়েছে।

১. শর্করা জাতীয় খাদ্যের সহজ উৎস

শর্করা জাতীয় খাবারের প্রধান কাজ হলো দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাপশক্তি উৎপাদন করা। আমাদের দৈনিক চাহিদার প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তির শতকরা প্রায় ৫০-৬০ ভাগ শর্করা জাতীয় খাবার থেকে পাওয়া যায়। শর্করার সহজলভ্য উৎস হিসেবে চাল, গম, ভুট্টা, চিড়া, মুড়ি, চিনি, গুড়, আলু, কচুরমুখী ইত্যাদি নিয়মিত খেতে হবে।

২. আমিষ জাতীয় খাদ্যের সহজ উৎস:

আমিষ জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করার পাশাপাশি দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দেহের ওজন অনুযায়ী আমিষের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে সাধারণ হিসাবে দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রতিদিন ০.৮৩ গ্রাম আমিষ গ্রহণ করা দরকার। আমিষ জাতীয় খাবারের প্রধান উৎস হলো মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, মটর শুঁটি, সীমের বীচি, কাঁঠালের বীচি, বাদাম ইত্যাদি। তবে মাছ মাংসের আমিষ বা প্রোটিনের অভাব দূর করতে সস্তায় পাওয়া সব রকম ডাল, সীমের বীচি, কুমড়ার বীচি, দেশী ফল ইত্যাদি খেতে হবে।

৩. স্নেহ জাতীয় খাদ্যের সহজ উৎস

স্নেহ জাতীয় পদার্থ আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদন করে। এর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা শর্করা জাতীয় খাবারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস হলো বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি। তবে সস্তা ও সুলভ

সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, তিলের তেল, সূর্যমুখীর তেল, চিনা বাদাম ইত্যাদি থেকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার স্নেহ জাতীয় উপাদান সহজে পেতে পারি।

৪. ভিটামিনের সহজ উৎস

আমাদের শরীরে ভিটামিনের প্রয়োজন খুব বেশি। কারণ এটি দেহ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। সহজে সকল প্রকার ভিটামিন পেতে আমাদের আশপাশে থাকা সবুজ শাক, পাকা পেঁপে, কাঁচা মরিচ, পুদিনা পাতা, ধনেপাতা, সজনে পাতা, মূলাশাক ইত্যাদি খেতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন টক জাতীয় ফল যেমন আমলকি, পেঁয়ারা, জাম্বুরা, আমড়া, লেবু ইত্যাদি থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

৫. মিনারেল বা খনিজ পদার্থের সহজ উৎস

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন মিনারেল বা খনিজ যেমন- ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের ওজনের মাত্র ০.০১ শতাংশ মাত্রায় বিদ্যমান এই 'ট্রেস এলিমেন্টগুলো' শরীরের বিভিন্ন এনজাইম, হরমোন এবং কোষ কলার অংশ বিশেষ। তাই এগুলো শরীরের জন্য খুবই অপরিহার্য। সবুজ শাকসবজি, টাটকা ফলমূল, দুধ, ডিম, ডাল, গোশত ইত্যাদিতে এসব মিনারেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় মিনারেল ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লোহা জাতীয় উপাদান পেতে বিভিন্ন প্রকার ছোট মাছ, শুকনা খাবার, শুকনা ফল, সরষে, সবজি, সবুজ শাক, কলার মোচা, কাঁচকলা ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

৬. পানি

একজন ব্যক্তির দৈনিক পানির চাহিদা নির্ভর করে তার বয়স, ওজন, পরিশ্রম, ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ইত্যাদির ওপর। একজন সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দিনে ৮-১০ গ্লাস (৩-৫ লিটার) পানি পান করা প্রয়োজন। রক্ত তরল রাখতে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ বের করে দিতে পানির ভূমিকা অপরিসীম। পানির অভাব মেটাতে পরিশোধিত পানিই যথেষ্ট। তাই শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য মানুষের জীবনের প্রধান ভিত্তি ও অবলম্বন। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও কর্মসামর্থ্য লাভের জন্য ভালো খাওয়া দাওয়ার ভূমিকা অপরিসীম। ভালো ভালো খাদ্য খেলেও যদি সুষম (ওয়েল ব্যালেন্সড) না হয় তাহলে সেটা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তাই কোন কোন খাদ্যে কী কী উপাদান বর্তমান তা প্রত্যেকের ভালোভাবে জানা দরকার।

১৭.২ কয়েকটি পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের তালিকা

শাক-সবজি

শাক সবজি সহজলভ্য পুষ্টির একটি উৎস। পুষ্টির চাহিদা মেটাতে শাক-সবজির উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। জমিতে, বাড়ির উঠানে ও ছাদে শাক-সবজির চাষ করতে হবে।

১. **গাজর-** গাজর একটি জনপ্রিয় সবজি। আসলে এটি হচ্ছে উদ্ভিদের মূল যা ফাইবার ও ভিটামিন-এ তে ভরপুর। গাজরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যারোটিনও রয়েছে।

২. **ফুলকপি-** ফুলকপি একটি সুস্বাদু সবজি। যা বিভিন্নভাবে রান্না করা হয়।

৩. **শসা-** শসা বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিত সবজি। এতে কার্বোহাইড্রেট ও ক্যালরি খুবই সামান্য পরিমাণে থাকে। শসাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-কে থাকে এবং অন্যান্য পুষ্টি অল্প পরিমাণে রয়েছে। শসার সালাদ একটা সুস্বাদু রেসিপি।

৪. **রসুন-** রসুন একটা স্বাস্থ্যকর সবজি। এর অনেক ঔষধি গুণও রয়েছে। রসুনে সক্রিয় অর্গান সালফার যৌগ রয়েছে যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

৫. **পেঁয়াজ-** রসুন ও পেঁয়াজ সচরাচর ব্যবহৃত একটি সবজি। পেঁয়াজে কিছু জৈব উপাদান রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য উপকারী। তাছাড়া, শাক সবজি ও অন্যান্য রেসিপিকে মজাদার করতে পেঁয়াজ তো লাগবেই।

৬. **টমেটো-** টমেটো একটি ফল হলেও এটি সবজি হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি সুস্বাদু হওয়ায় সালাদেও ব্যবহার করা হয়, টমেটো দিয়ে বানানো হয় টমেটো সস। টমেটোতে রয়েছে পটাসিয়াম ও ভিটামিন-সি।

৭. **অন্যান্য স্বাস্থ্যকর শাকসবজি-** হলুদ বা সবুজ সব শাকসবজিই পুষ্টিতে ভরপুর। উল্লেখযোগ্য শাকসবজির মধ্যে রয়েছে- কাঁচ কলা, মুলা, শিম, বেগুন, বাঁধা কপি, মাশরুম, শালগম ইত্যাদি।

ফল:

১. **লিচু-** ষড়ঋতুর এই দেশে বিভিন্ন মৌসুমে পাওয়া যায় নানান পুষ্টিকর ফল। এসব ফল আমাদের শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনই একটি ফল লিচু।

২. **কাঁঠাল-** মানুষের দেহে যে সব পুষ্টির প্রয়োজন প্রায় সবই আছে কাঁঠালের মধ্যে। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল।

৩. **জামরুল-** মৌসুমী ফল হিসেবে জামরুল যেমন দেখতে টসটসে তেমনি সহজলভ্যও। বিশেষ যত্ন ছাড়াই ফলন দেয় ঝাঁকে ঝাঁকে। তবে জামরুল খেতে অনেকটা পানসে বলে অনেকেই ভাবেন এর বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। কিন্তু উপকারের কথা জানলে স্বাস্থ্য নিয়ে যারা উদাসীন, তারাও নিয়মিত খেতে শুরু করবেন এটি।

৪. **জাম-** জাম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। জামে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। আর আয়রন থাকার ফলে রক্তে হিমোগ্লোবিন বেড়ে যায়। ফলে রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। যারা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন তাদের জন্য জাম খুবই ভালো।

৫. **আনারস-** আনারস হচ্ছে ঔষধি গুণসম্পন্ন ফল। আনারস খাওয়া শরীরে জন্য অত্যন্ত উপকারি।

৬. **আম-** 'আম'-কে ফলের রাজা বলা হয়, আর এই ফলটিকে সবাই কম বেশি পছন্দ করেন। আমাদের দেশের আমের প্রচুর জাত রয়েছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিমসাগর, ল্যাংড়া, হাড়িভাঙ্গা, আম্রপালি, ফজলি, লক্ষ্মণভোগ ইত্যাদি।

৭. **কলা-** কলা অতি জনপ্রিয় একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এ ফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, ভিটামিন এ বি সি এবং ক্যালসিয়াম, লৌহ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশক্তি রয়েছে।

৮. **বিলেম্বু-** গরমকালের পরম উপকারী ফল। খেতে প্রচুর টক। এই ফল কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায়।

৯. **জাম্বুরা-** এটি বাতাবি লেবু নামেও পরিচিত। ভিটামিন-সি, বিটা ক্যারোটিন আর ভিটামিন বি-তে ভরপুর এ জাম্বুরা।

১০. **চালতা-** ঔষুধি ও পুষ্টিগুণে ভরপুর চালতা ফলটি। আচার হিসাবেই বেশ পরিচিত এই ফলটি সবার কাছে।

১১. **কাগজি লেবু-** লেবুর শরবত হিসেবেই বেশ পরিচিত কাগজি লেবু। লেবু সাধারণত দুই ধরনের- গোল লেবু এবং কাগজি লেবু। এর মধ্যে বিচিবিহীন কাগজি লেবুর জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রচুর ভিটামিন সি থাকে।

অন্যান্য খাবার:

১. **ডিম -** ডিমেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি। কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকার কারণে আগে অনেকে ডিম খেতে চাইত না। কিন্তু বর্তমানে নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে ডিম একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য।

২. **চর্বিযুক্ত গরুর মাংস-** আমাদের শরীরের জন্য আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। চর্বিযুক্ত গরুর মাংসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, আয়রন ও অন্যান্য জৈব পদার্থ।

৩. **মুরগির মাংস-** মুরগির মাংসে খুব বেশি পরিমাণ প্রোটিন থাকে কিন্তু খুব অল্প পরিমাণ চর্বি ও ক্যালরি থাকে। তাই যারা স্বাস্থ্যবান ও মোটা হতে চান না তারা আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য নিঃসন্দেহে মুরগির মাংস খেতে পারেন।

৪. **মেষশাবক-** এদের মাংসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণ থাকে।

৫. **বাদাম-** বাদাম ভিটামিন-ই, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ম্যাগনেসিয়াম ও ফাইবার সমৃদ্ধ একটি জনপ্রিয় খাবার। বাদাম পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি শরীরের ওজন কমায় ও হজমে সহায়তা করে।

৬. **তিসি বীজ-** চিয়া বা তিসি বীজও পৃথিবীর পুষ্টিকর খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এতে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফাইবার,ম্যাগনেসিয়াম,ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান।

৭. **নারিকেল-** নারিকেলে ফাইবার ছাড়াও রয়েছে শক্তিশালী ফ্যাটি অ্যাসিড যা মিডিয়াম-চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড (MCT) নামে পরিচিত।

৮. **চিংড়ি মাছ-** চিংড়ি পরিচিত একটি মাছ। চিংড়িতে চর্বি ও ক্যালরি অল্প পরিমাণে থাকে কিন্তু প্রোটিন খুব বেশি পরিমাণে থাকে। তাছাড়া চিংড়ি সেলেনিয়াম ও ভিটামিন বি-১২ সহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভরপুর।

৯. **আরো অন্যান্য মাছ-** সাধারণত সব মাছই পুষ্টিকর। যেমন- টেংরামাছ, পুঁটিমাছ, কৈ মাছ,শিং মাছ, টাকি মাছ ইত্যাদি।

১০. বাদামী চাল- ভাত অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেও বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। ব্রাউন চালে যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার, ভিটামিন বি-১ ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা রয়েছে ভাত খেলে ওজন বাড়ে, একথা ঠিক নয়। ব্রাউন চালে ফাইবার রয়েছে যা শরীরের ওজন কমায় ও হজমে সহায়তা করে। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত সাদা চাল খেলে এর উল্টো হয় অর্থাৎ ওজন বাড়ে। তাই আমাদের সাদা চালের ভাতের পরিবর্তে বাদামী চালের ভাত খেতে হবে।

১১. রুটি- বাদামী আটার রুটিও একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য। তবে আমাদের প্রক্রিয়াজাত সাদা আটার পরিবর্তে বাদামী আটার রুটি খেতে হবে।

১২. মটরশুঁটি- অন্যান্য দানাদার শস্য জাতীয় খাদ্যের মতো মটরশুঁটিতে রয়েছে ফাইবার, বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন ও মিনারেল।

১৩. মসুর ডাল- মসুর ডাল আরেকটি প্রিয় খাদ্য, আমরা ডাল ভাতের সঙ্গে খুব পরিচিত। মসুর ডালে রয়েছে ফাইবার ও উদ্ভিদ ভিত্তিক প্রোটিন।

১৪. দুগ্ধজাত খাবার- দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম রয়েছে। ঘাস খাওয়া গরুর দুধে পুষ্টির পরিমাণ বেশি। দুধ থেকে বানানো হয় দই, প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে গাঁজন প্রক্রিয়ায় এই দই তৈরি হয়। এই প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী।

১৫. আলু- আলুতে রয়েছে পটাসিয়াম ও ভিটামিন-সি সহ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান।

১৬. মিষ্টি আলু- মিষ্টি আলু স্টার্চযুক্ত পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার। মিষ্টি আলু এন্টিঅক্সিডেন্টে সহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভরপুর।

চিত্রঃ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার

১৮. বসতবাড়ির বনায়ন

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. বসতবাড়ির বনায়ন কী?
২. একটি আদর্শ বসতবাড়ির বনায়ন ধারার গঠন;
৩. বসতবাড়িতে পরিকল্পিত কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা;
৪. কীভাবে বসতভিটায় ফল-ফলাদি গাছ রোপন করা যায়?

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে বসতবাড়ির বনায়ন কী এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- একটি আদর্শ বসতবাড়ির বনায়ন ধারার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- বসতবাড়িতে পরিকল্পিত কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন;
- কীভাবে বসতভিটায় ফল-ফলাদি গাছ রোপন করা যায়;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

ভূমিকা

বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন হলো বসতবাড়ির আনাচে-কানাচে বনজ ও ফলজ বৃক্ষ, শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ, ঔষধি এবং অন্যান্য উদ্ভিদ। এটি আবার জীবন নির্বাহ কৃষি বনায়ন ধারাও বটে। বসতবাড়ীর বনায়নের মূল লক্ষ্য হতে পারে পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা।

১৮.১ একটি আদর্শ বসতবাড়ির বনায়ন স্থান নির্বাচন পরিকল্পনা

প্রায় প্রতিটি বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের অস্তিত্ব থাকলেও যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে তা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ফলে ধারণাটি পুরনো হলেও মানুষ এটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। অথচ পরিকল্পনামাফিক বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের মাধ্যমে একটি পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব। একটি আদর্শ বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন ধারা গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে-

১. বসতবাড়ির চারপাশের সীমানায় বেড়া হিসেবে মান্দার, ভেরেন্ডা, পলাশ, জিগা ইত্যাদি উদ্ভিদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বসতবাড়ির সীমানা নির্ধারণ ছাড়াও সুরক্ষার কাজও করবে।

২. বাড়ির আঙিনায় শাকসবজির চাষ করতে হবে।

৩. বসতবাড়ির আঙিনার ফাঁকা স্থানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, বেল, পেঁপে, নিম, বহেড়া, হরিতকী, তুলসী, সজিনা, নারিকেল, সুপারি, বকুল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যায়।

৪. বসতবাড়ির সীমানায় পুকুর থাকলে সেখানে বিভিন্ন ধরণের মাছের চাষ করতে হবে। পুকুরের পাড়ে বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষরোপণ (নারিকেল, সুপারি, ইপিল-ইপিল, মেহগণি, খেজুর, কড়ই ইত্যাদি) করতে হবে। এতে গরমের সময় মাছের উপকার হয়। এখানে বেশি শিকড়বিশিষ্ট গাছ লাগালে পুকুরের পাড়ের মাটি ভাঙবে না।

৫. বিভিন্ন ছায়াসহনশীল উদ্ভিদ যেমন- আদা, হলুদ ইত্যাদি দুই বৃক্ষের মাঝে লাগাতে হবে।

৬. বসতবাড়িতে যতটুকু সম্ভব গবাদিপশু-পাখি (হাঁস-মুরগি, কোয়েল, কবুতর, গরু, ছাগল, মৌমাছি ইত্যাদি) পালন করতে হবে।

৭. সর্বোপরি স্থান-অবস্থান, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, সামর্থ্য, সহজপ্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বসতবাড়ির কৃষি বনায়ন সৃষ্টির উপাদানগুলো নির্বাচন করতে হবে এবং যথাযথ নিয়মে এর পরিচর্যা করতে হবে।

১৮.২ বসতবাড়িতে পরিকল্পিত কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

১. এদেশের অধিকাংশ জনগণই অত্যন্ত গরিব, অনেকের শুধু বসতবাড়ি ছাড়া আর কোনো কৃষি জমি নেই। অথচ এদেশের গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়িগুলো হচ্ছে সনাতন কৃষি বনায়ন ধারা তথা বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাচীন উদাহরণ। কৃষাণ-কৃষাণিরা বহু পূর্বকাল থেকেই একই আঙিনায় নিজেরা বসবাস করা ছাড়াও শাকসবজি চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, হরেক রকমের ফলজ, বনজ এবং শোভাবর্ধনকারী গাছপালা একই সঙ্গে উৎপাদন ও পালন করে আসছেন।

২. বাংলাদেশে বসতবাড়ির বাগান থেকেই অধিকাংশ ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশুখাদ্য ইত্যাদি উৎপাদন ও সংগ্রহ করা হয়। দেখা গেছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালি জ্বালানির প্রায় ৮০ শতাংশ যোগান বসতবাড়ি এবং পাশের জমি থেকেই আসে। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ঘাটতি থাকায় বসতবাড়িভিত্তিক এ উৎপাদন ব্যবস্থার ফলন তেমন আশাব্যঞ্জক নয়।

৩. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বসতবাড়ি এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহৃত। ভৌত অবস্থান, কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পদ ভিত্তি ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে কৃষি বনায়ন তথা একটি সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সেটা হবে আগামী শতকের প্রধান অবলম্বন, যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বহু বছর ধরে খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি যোগান দেবে।

৪. গাছ বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করবে ও ঝড়-বাতাস থেকে ঘরবাড়িকে রক্ষা করবে।

৫. কৃষি বনায়ন আয়েরও একটি ভালো উৎস হতে পারে। তাই সুপরিকল্পিতভাবে কৃষি বনায়ন ধারা অনুসরণ করে বসতবাড়ির আঙিনা ও তার আশেপাশের জমি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল, শাকসবজি, ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশু খাদ্য, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন করা একান্তই প্রয়োজন।

৬. দ্রুত বর্ধনশীল ফলজ এবং বনজ বৃক্ষের সমন্বয়ে একটি বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য বসতবাড়ি বাগান গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে খাদ্যের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।

১৯. উঁচুকৃত বসতভিটায় ফল-ফলাদির গাছ রোপণ

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. উঁচুকৃত বসতভিটায় ফল-ফলাদির গাছ রোপণের প্রয়োজনীয়তা

২. কীভাবে বসতভিটায় ফল-ফলাদি গাছ রোপন করা যায়

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে ফল-ফলাদির গাছ রোপণ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- উঁচুকৃত বসতভিটায় ফল-ফলাদির গাছ রোপণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন;
- কীভাবে বসতভিটায় ফল-ফলাদি গাছ রোপন করা যায় আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

বসতভিটায় ফল-ফলাদির গাছ রোপণ কেন দরকার	সুবিধাভোগী কারা
১. বসতবাড়িতে ফল-ফলাদির গাছ পরিবারের সদস্যদের নিকট পুষ্টি সমৃদ্ধ ফলমূল সহজলভ্য করে। ২. সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার ফলমূল খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের যোগান নিশ্চিত করে। ৩. বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা অন্যান্য খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে পারে। ৪. বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে মা ও শিশু কিশোরদের রক্ষা করে। ৫. উঁচুকৃত বসতভিটার প্রতিটি অংশের ব্যবহার নিশ্চিত করে। ৬. বসতবাড়িতে ফল-ফলাদির গাছ পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করে। ৭. বসতবাড়িতে ফল-ফলাদির গাছ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে।	১. দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র পরিবার (যাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৭৫ ইউএস ডলারের কম)। ২. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠি যাদের কিছুটা ফলফলাদি চাষের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, যাদের চাষযোগ্য কৃষি জমি নেই। ৪. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের ফল-ফলাদি চাষের আগ্রহ রয়েছে। ৫. যাদের বসতভিটা ইতোমধ্যে উঁচুকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

মনে রাখতে হবে-

১. বাড়িতে বৃক্ষ রোপণের সময় দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতির এবং যেসব গাছের ডাল-পালা কম হয় সেগুলো নির্বাচন করতে হবে যাতে খোলামেলা বাতাস সহজেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।

২. উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রকৃতির গাছের চারা এবং পশ্চিম পার্শ্বে মাঝারি আকৃতির গাছ লাগানো উপযোগী।

৩. বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে পেয়ারা, ডালিম, লেবু, পেঁপে ধরণের গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

৪. এছাড়া দু-একটা নিম গাছ রোপণ করলে স্বাস্থ্যকর বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়।

৫. ছায়াযুক্ত জায়গায় আদা, হলুদের চাষ করা যেতে পারে।

৬. বাড়ির গেটে কিছু বাহারী গাছ রোপণ করে বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধন করা যায়।

৭. চরাঞ্চলে ঝাউ জাতীয় গাছের চারা রোপণ করে এবং ধৈঞ্চা বীজ বপন করে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া যায়।

৮. এছাড়া কলা গাছ রোপণ করে বাড়তি পুষ্টি ও আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। বন্যার সময় কলা গাছের ভেলা চরের বাসিন্দাদের জরুরি বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্র: উঁচুকৃত বসতভিটায় ফল-ফলাদির গাছ রোপণ

২০. দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কী? দুর্যোগের প্রকারভেদ
২. আপদ, বিপদাপন্ন, বিপদাপন্নতা কী?
৩. দুর্যোগ ও নারী;
৪. দুর্যোগে প্রস্তুতিমূলক কাজ?

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- দুর্যোগ ও নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন;
- দুর্যোগে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো আলোচনা করুন;
- উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা।

২০.১ দুর্যোগ

দুর্যোগ হলো প্রকৃতি বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বা সংঘটিত এমন ঘটনা যা চলমান সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যেটা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত দুর্যোগ বলতে আপদ বুঝালেও সকল আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপদাপন্নতা একত্রিত হলেই তাকে দুর্যোগ বলে। যেমন-ঘূর্ণিঝড় সিডর হলো আপদ। এর কারণে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যখনই হলো তখন ইহা দুর্যোগ। দুর্যোগ=আপদ x বিপদাপন্নতা বা ক্ষতির সম্ভাবনা

২০.২ আপদ

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা দুর্যোগ যা ধন-সম্পদ, অবকাঠামো, জীবিকা, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক সম্পদসহ জীবনহানি বা স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে, তাকে আপদ বলে। যেমন: বন্যা একটি আপদ। এটি সংঘটিত হলে জীবন ও জীবিকার ক্ষতি সাধন হতে পারে।

২০.৩ বিপদাপন্ন

যখন কোনো এলাকার জনগোষ্ঠী দুর্যোগ অথবা কোনো ধরণের ঝুঁকি দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা সৃষ্ট ফলাফল মোকাবেলায় অসমর্থ হয় তখন সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বিপদাপন্ন বলে।

২০.৪ বিপদাপন্নতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কোনো জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সম্পদ ইত্যাদি নেতিবাচকভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বা অবস্থাকে বিপদাপন্নতা বলে। আক্রান্ত হলে ক্ষতির মাত্রা এবং খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনের সক্ষমতার উপর বিপদাপন্নতা নির্ভর করে। যেমন: ক্ষুদ্র কৃষকের জমির ফসল বন্যায় আক্রান্ত হলে তা যদি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার আয়ের অন্য উৎস না থাকে তাহলে একজন ধনী কৃষকের চেয়ে বেশি বিপদাপন্ন হবে কারণ ধনী কৃষকের উক্ত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা বেশি।

২০.৫ দুর্যোগের প্রকারভেদ

দুর্যোগকে সামগ্রিকভাবে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেমন- বন্যা, ঝড়, খরা ইত্যাদি

২. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। যেমন- অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধ ইত্যাদি

২০.৬ দুর্যোগ ও নারী

দুর্যোগের সময় আমাদের দেশের নারীরা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর মধ্যে-

১. রান্নার সমস্যা

২. খাওয়ার পানি সংগ্রহে অসুবিধা

৩. জ্বালানী সমস্যা

৪. নিরাপত্তাজনিত সমস্যা

২০.৭ দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কাজ

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে যে কাজগুলো করা হয় তাকে বন্যার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড বলে। তিন পর্যায়ে এ প্রস্তুতি নেওয়া হয়, যথা : বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, বন্যাকালীন কাজ এবং বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে করণীয়।

২০.৭.১ দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড

১. সঞ্চয় করা।

২. আলগা চুলা তৈরি করা ও জ্বালানি সংগ্রহ করে উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে শুকনো খাবার চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা।

৩. ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা।

৪. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খাবার সংরক্ষণ করা, গবাদিপশু-পাখিকে প্রতিষেধক টিকা দেয়া।

৫. প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা।

৬. ডায়রিয়া প্রতিরোধে কার্যকর খাবার স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় তা জেনে রাখা।

৭. দুর্যোগকালীন সময়ে গর্ভবতীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে আগেই তাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে ।

২০.৭.২ দুর্যোগকালীন কাজ

১. দুর্যোগকালীন সময়ে নিয়মিত দুর্যোগের খবর জানার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিপদের সংবাদ সবাইকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

২. প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া।

৩. নিরাপদ আশ্রয় গমনে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. নিরাপদ পানি সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিওদের নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে।

৬. নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২০.৭.৩ দুর্যোগ পরবর্তী কাজ

১. বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে, নোংরা আবর্জনা মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

২. অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত বর্ধনশীল শাকসবজির চাষ করতে হবে।

৩. দুর্যোগের পর সরকারি-বেসরকারি পুনর্বাসন-সুবিধা সম্বন্ধে জানা ও তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৪. দুর্যোগের পানিতে তলিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া নলকূপ সংস্কার করতে হবে।

২১. সামাজিক বিষয়

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. নৈতিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কী?
২. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ কী কী?
৩. নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা কী?
৪. নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ অর্জনে করণীয়সমূহ কী কী?
৫. যৌতুক, মাদকাসক্তির কুফলসমূহ কী কী?

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- ➢ কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- ➢ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে নৈতিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- ➢ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ আলোচনা করুন;
- ➢ নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন;
- ➢ নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ অর্জনে করণীয়সমূহ আলোচনা করুন;
- ➢ যৌতুক, মাদকাসক্তির কুফলসমূহ আলোচনা করুন;
- ➢ উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- ➢ সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

২১.১ নৈতিক শিক্ষা

কোনো সমাজের সকল মানুষ যখন তিল তিল করে গড়ে ওঠা সেই সকল নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবগত ও শ্রদ্ধাশীল হয়, কেবলমাত্র তখনই একটি সুষ্ঠু আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। মানুষের মধ্যে সামাজিক নীতির এই সার্বিক উদ্ভাসকেই বলা হয় নৈতিক শিক্ষা বা নৈতিকতাবোধ।

নৈতিক শিক্ষার গুণাবলী

১. সততা
২. মিথ্যা কথা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা
৩. বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা
৪. ধর্মীয় মূল্যবোধ
৫. মা-বাবার প্রতি করণীয় বিষয়গুলি মেনে চলা
৬. বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি দায়িত্ব
৭. সন্তানদের প্রতি করণীয়
৮. দেশের প্রতি দায়িত্ব
৯. ন্যায়বিচার
১০. ধৈর্য্য
১১. বিচক্ষণতা
১২. দৃঢ়তা
১৩. মানবতা
১৪. সাহসিকতা

নৈতিকতা

নৈতিকতা হলো নীতি সম্পর্কিত বোধ, এটি একটি মানবিক গুণসমষ্টি যা অন্য আরো অনেক গুণের সমন্বয়ে তৈরি হয়। মানুষ তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি খুব সচেতনভাবে মেনে চলে। সমাজ বা রাষ্ট্র আরোপিত এই সব নিয়ম-নীতি ও আচরণ বিধি মানুষের জীপনযাপনকে প্রভাবিত করে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার প্রবণতা, মানসিকতা, এবং নীতির চর্চাই হলো নৈতিকতা।

২১.২ মূল্যবোধ

অনেকেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে এক মনে করেন। কিন্তু দুটি বিষয় এক নয়। দীর্ঘদিন একই সমাজে একসাথে বাস করার ফলে অর্জিত মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। মূল্যবোধের ভিত্তি হলো ধর্ম, দর্শন, দীর্ঘদিনের লালিত আচরণ-বিশ্বাস, সমাজের নিজস্ব আদর্শ ও নিয়ম-নীতি। সমাজে বিদ্যমান রীতি-নীতি ও প্রথার প্রেক্ষিতে ভালো-মন্দ, ভুল-সঠিক, কাঙ্খিত, অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের মানুষের যে ধারণা সেগুলোই হলো মূল্যবোধ।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

অবক্ষয় বলতে যে কোনো কিছুর ক্ষয়প্রাপ্তিকে বুঝায়। অর্থাৎ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যখন বিলুপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মানুষ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে তখন তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে। আমাদের দেশের যুব-সমাজের দিকে তাকালে এই অবক্ষয়ের এক করুণ ও প্রত্যক্ষ চিত্র আমরা দেখতে পাই। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী এই অবক্ষয়ের কারণে নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারের পথে, আসক্ত হচ্ছে মাদকে। ছিনতাই, অপহরণ, গুম, খুন, হানাহানি, নষ্ট রাজনীতি আর সন্ত্রাসে প্রতিনিয়ত জড়িয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে গলা টিপে হত্যা করে মূল্যবোধ আর নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সব বয়সী মানুষ আজ চলেছে ধ্বংসের পথে। যে ছেলেটির হওয়ার কথা শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা প্রশাসক সে আজ হয়ে যাচ্ছে চোরাচালানকারী, মাদক ব্যবসায়ী কিংবা সন্ত্রাসী। যার দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তারা আজ অন্যায় করে ব্যাহত করছে দেশের অগ্রযাত্রাকে। এসব কিছুর জন্য আসলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই দায়ী।

অবক্ষয়ের কারণ

পৃথিবীতে কেউই পাপী কিংবা অপরাধী হয়ে জন্মায় না। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থাই তাকে ভালো কিংবা খারাপ করে গড়ে তোলে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ তাই দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়- প্রথমত পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক কারণ, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক কারণ।

পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক কারণ

একসাথে চলতে গেলে একজন মানুষ খুব সহজেই আর একজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর তাই অসৎসঙ্গে পড়ে কেউ কেউ তার নীতি নৈতিকতাকে, মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরীরা অন্য বন্ধুর প্ররোচনায় মাদকে আসক্ত হয়। কেউ কেউ আবার ছিনতাই ও অন্যান্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

কলহপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। পরিবারের সদস্যদের নেতিবাচক মনোভাব, নীতিহীনতা, মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে পরিবারের কাছ থেকে ব্যক্তি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা পায় না। আর যেটুকু সহজাত থাকে তাও হারিয়ে ফেলে।

অনেক সময় মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষ তার নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। অধিক সুখ আর বিলাসী জীবনের আশায় মানুষ যখন বিপথগামী হয় তখন সে মূল্যবোধকে অবলীলায় ভুলে যায়। নিরক্ষরতা, শিক্ষা সংকট এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকার কারণেও মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত একজন মানুষ নীতি ও মূল্যবোধে দৃঢ় থাকতে পারে না। কারণ অভাব কখনো কখনো মানুষকে বিমূঢ় করে দেয়। নিজের দুঃখ-কষ্ট ঘুচাতে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে মানুষ তাই অনেক সময় বেছে নেয় অসৎ পথকে। সে ভুলে যায় তার নীতি কথা ও মূল্যবোধকে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার তেমন কোনো চর্চা নেই। ফলে আমাদের আমলা থেকে মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা পর্যন্ত মূল্যবোধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এর অপব্যবহার করেন।

২১.৩ নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

১. শুধুমাত্র অবক্ষয় রোধের জন্যই নয় বরং জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রয়োজন।
২. নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তার নীতিতে অটল থাকে, মূল্যবোধের ওপর আস্থা রাখে।
৩. নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন একজন মানুষকে সঠিক ও শুদ্ধ মানুষ রূপে গড়ে তোলে তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
৪. নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ থাকার কারণেই মানুষ তার নিজের, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে।
৫. নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ অন্যকেও উৎসাহিত করে নীতিবান হতে, মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে।
৬. যার মধ্যে নৈতিক শিক্ষা থাকে পারিপার্শ্বিকতার দোহাই দিয়ে সে অন্যায়-অপরাধ করে না। বরং সে নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে।

২১.৪ নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ অর্জনে করণীয়

১. মানুষের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো তার পরিবার। তাই নৈতিক শিক্ষা আর মূল্যবোধের শিক্ষাও শুরু হয় পরিবারে। পরিবারের উচিত তার শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেয়া এবং সামাজিক মূল্যবোধগুলো জানানো। পরিবারের উচিত শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া। কারণ ধর্ম নৈতিকতা শেখায়, মূল্যবোধ শেখায়।
২. বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যসূচীতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার উপযোগী বিষয়বস্তু থাকতে হবে।
৩. অন্যের সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুকরণের যে চেষ্টা তা সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে।
৪. গণমাধ্যম থেকে আমরা অনেক কিছু শিখে থাকি। তাই গণমাধ্যমগুলোতে এমন বিষয় প্রচার করা উচিত যেগুলো থেকে মানুষ নৈতিক শিক্ষা পাবে এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জানবে।
৫. মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে থেকে সচেতন হতে হবে।

২১.৫ যৌতুক কী?

বিবাহের এক পক্ষের অভিভাবক কর্তৃক অপরপক্ষকে বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে পণ হিসেবে কোনও মূল্যবান সম্পত্তি বা পণ্য বা জামানত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদান করা বা প্রদানে সম্মত বা বাধ্য করা। শহুরে শিক্ষিত পরিবারে মেয়ের বিয়ের সময় সরাসরি অর্থের বদলে গয়না, ঘরের আসবাবপত্র, গৃহস্থালিতে ব্যবহারের নানা সামগ্রী উপহার হিসেবে দেয়া হয়। জামাতাকে এমনকি ফ্ল্যাট বা গাড়ি উপহার দেয়ার প্রচলনও রয়েছে। গ্রামীণ পরিবারে গয়না, টাকা, মোটর সাইকেল দেয়ার প্রচলন রয়েছে। তবে টাকার দাবিটাই বেশি।

চিত্রঃ যৌতুক প্রথা

২১.৬ যৌতুকের শাস্তি

কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান, গ্রহণ বা দাবি করলে সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর মেয়াদের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করলে অপরাধী মৃত্যুদণ্ড এবং হত্যার চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দণ্ডনীয় হবে। উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ড অতিরিক্ত অর্থদণ্ড দণ্ডনীয় হবে।

২১.৭ যৌতুকের কুফল

যৌতুকের কারণে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয় , কন্যার পরিবার যৌতুকের দায় মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, লোভে চরিত্র নষ্ট হয়, শিশুরা বাবা মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়। সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়, অনেক সময় এ কারণে সংসার ভেঙ্গে যায়। যৌতুক একটি অগ্রহণযোগ্য কাজ। এর দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন যৌতুক কারো জন্যই সুখকর নয়। এটি ধর্মীয়, অসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিক থেকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যৌতুক গ্রহণকারী সমাজ ও পরিবারের কাছে ঘৃণিত, স্ত্রীর কাছে নিন্দনীয় ও অপমানের, নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কাজ ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী। নারী নির্যাতন, শ্রম শোষণ, পৌরুষের দিক থেকে দুর্বল মনের পরিচায়ক, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে লজ্জাজনক।

২১.৮ মাদকাসক্তির কুফল

চিত্রঃ নারী নির্যাতন

যে সমস্ত প্রাকৃতিক দ্রব্য বা রাসায়নিক দ্রব্য গ্রহণ করার ফলে একজন মানুষের মনের অনুভূতি ও চিন্তা চেতনা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, তাকেই মাদক বলে। মাদক এমন একটি দ্রব্য, যা খেলে নেশা হয়। গাঁজা, ফেনসিডিল, চরস, ভাং, গুল, জর্দা, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মদ, ইয়াবাসহ সবই মাদকের অন্তর্ভুক্ত।

যখন কেউ এসব দ্রব্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখনই তাকে মাদকাসক্ত বলা হয়। ১৯৮৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকাসক্ত বলতে, শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে বুঝানো হয়েছে। মাদকাসক্ত হলে দৈনন্দিন কাজে ব্যাহত হয়, প্রত্যেকটি মানুষের শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই ভালো লাগা জিনিসটা ভালোলাগায় থাকে না। ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২১.৯ কেন এই আসক্তি

মানুষকে মাদকাসক্তির দিকে পরিচালিত করার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক অস্থিরতা, উত্তেজনা, একঘেয়েমি, একাকিত্ব এবং পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তনের পরিবেশে ব্যর্থতার সঙ্গে লড়াই করতে অক্ষমতা। তবে মাদকাসক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হলো মাদকের সহজলভ্যতা।

দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক উন্নয়ন এবং ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, সামাজিক সচেতনতার অভাব ইত্যাদিও মাদকের সমস্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। পারিবারিক কলহ, ডির্ভোসের কারণে ভেঙে যাওয়া পরিবার, প্রেম ও চাকরিতে ব্যর্থতা থেকে হতাশার কারণেও মাদকাসক্তের হার বাড়ছে। প্রথমবারের মতো মাদক গ্রহণের জন্য কৌতূহল অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করে।

২১.১০ মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিক

চিত্রঃ মাদক সেবন

একবার আসক্ত হয়ে পড়লে তাকে মাদকের সর্বনাশা ছোবল থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এ ব্যাপারে পরিবারকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। একটি পরিবারে বা সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিই যথেষ্ট। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিকসহ নানা ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। শারীরিক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে মুখমণ্ডল ফুলে যাওয়া, হঠাৎ চোখে কম দেখা, মুখ ও নাক লাল হওয়া, যৌনশক্তি কমে যাওয়া, মুখমণ্ডলসহ সারা শরীরে কালশিরে পড়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, বুক ও ফুসফুস নষ্ট হওয়া, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, চর্ম ও যৌন রোগ বৃদ্ধি পাওয়া, সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তির কোষ ধ্বংস করা। মাদক গ্রহণে শারীরিকভাবে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন- অনিয়মিত মাসিক, জরায়ুর বিভিন্ন প্রকার রোগ, নারীর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াসহ বিভিন্ন যৌনরোগ দেখা দেয়। সম্প্রতি মাদকাসক্তদের মধ্যে এইডস দেখা দিচ্ছে বলে মনে করেন চিকিসৎকরা। মানসিক ক্ষতির একটা বড় রূপ রয়েছে, যা সব সময় বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় যেমন পাগলামি করা, মাথা ঘোরা ও খিটখিটে মেজাজ, অলসতা ও উদ্বেগ, হতাশাগ্রস্ত হওয়া, স্নেহ-ভালোবাসা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। কারণ যে পরিবারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সে পরিবারে কোনো সুখ-শান্তি থাকে না। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের অলংকার ও টাকা-পয়সা চুরি করে আর সেটা না পারলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে জোর করে অস্ত্র দেখিয়ে অর্থ নিয়ে তার চাহিদা মেটায়। সমাজে চলে চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় আতঙ্ক। বর্তমানে দেশের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেও এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে।

২২. পিকেএসএফ এর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ নিরসন

সেশন শেষে দলের সদস্যরা জানতে পারবেন-

১. অভিযোগ কী?

২. অভিযোগ নিরসন/প্রশমন কৌশল কিভাবে কাজ করে?

সময়: ৯০ মিনিট

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, ছবি প্রদর্শন।

সেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- ➢ কুশল বিনিময়ের পরে কেন এই সেশন নিচ্ছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;
- ➢ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছ থেকে অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জেনে নিন;
- ➢ অভিযোগ নিরসন/প্রশমন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন;
- ➢ উপস্থাপনের পর প্রশ্ন করা ও ফিরতি বার্তা নেয়া;
- ➢ সেশনের সারাংশ উপস্থাপন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করা

অভিযোগ কি?

অভিযোগ হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা অপরাধ বা অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কোনো মানুষ যখন আঘাত পেয়ে থাকে বা তাকে শারীরিক বা নৈতিকভাবে আক্রমণ করা হয়, তখন যে প্রতিক্রিয়া দেয় তা হলো অভিযোগ। অভিযোগটি মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

পিকেএসএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো নীতি অনুসারে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোনো কর্মকাণ্ডের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলে এবং এর ফলে সমাজের কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি/তারা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

অভিযোগ নিরসন/প্রশমন কৌশল

১. মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার এর ফোকাল পার্সন হিসেবে কাজ করবে।

২. পিকেএসএফ পর্যায়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ফোকাল পার্সন হিসেবে কাজ করবে।

৩. প্রাথমিকভাবে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থা তার অভিযোগ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার অফিস বা ইউনিয়ন পরিষদে একটি সিল করা খামে বা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৪. সহযোগী সংস্থা খাম না খুলে স্থানীয় ফোকাল পার্সনকে অবহিত করবেন।

৫. স্থানীয় পর্যায়ে যদি অভিযোগ নিরসন না হয় তা হলে পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী বরাবর অভিযোগটি দাখিল করবেন বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিও সরাসরি অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

৬. এছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) বরাবর সরাসরি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৭. যদি এ পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন না হয় তিনি সরাসরি পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পর্যালোচনা করবেন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। প্রয়োজনে তিনি পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে অবগত করবেন।

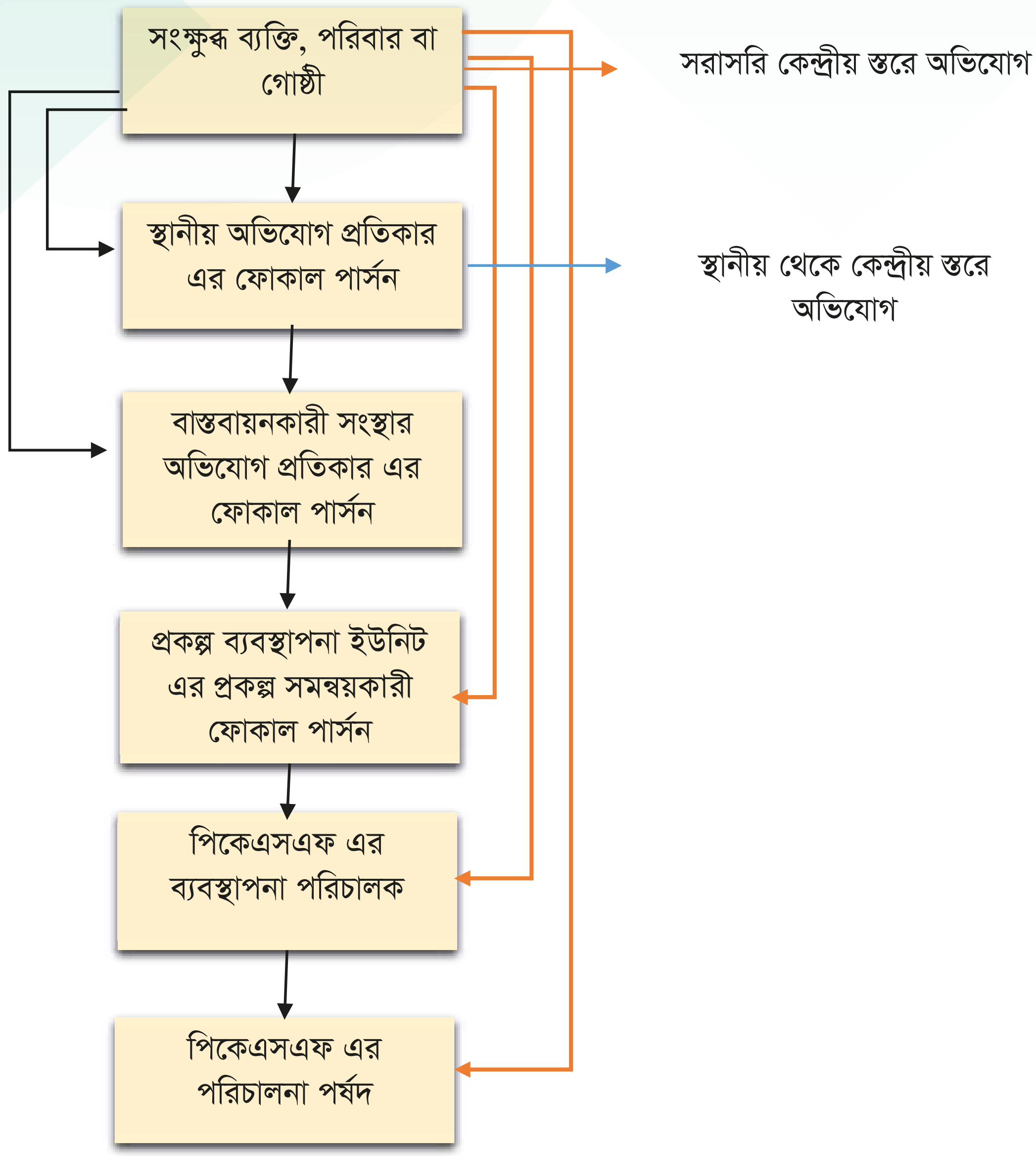

চিত্র: অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ০২ ২২২২১৮৩৩১-৩৩, ফ্যাক্স ঃ ০২ ২২২২১৮৩৪১
ই-মেইল ঃ pksf@pksf.org.bd, ecccpflood.pksf@gmail.com